প্রেমশূন্য

সুব্রত কুমার রায়

নিশা পাবলিশিং
শ্রীরামপুর, হুগলী

উৎসর্গ

শ্রীবিশ্বজিৎ গোস্বামী

সুহৃদবরেষু

প্রথম প্রকাশ

অক্ষয় তৃতীয়া ১৩৭০

প্রকাশিকা—শ্রীমতী নিশা রায়

নিশা পাবলিশিং

শ্রীরামপুর, হুগলী

প্রচ্ছদপট—সুব্রত কুমার রায়

শ্রীরামপুর, হুগলী

প্রচ্ছদ ব্লক করেছেন :

এস্ কুমার, টালিগঞ্জ, কলিকাতা

মুদ্রণে—সরযূ প্রিন্টিং ওয়ার্কস

বটতলা, শ্রীরামপুর, হুগলী

প্রীতি উপহার

ভূমিকা

'সাহিত্য দুর্ভিক্ষ'-র দিনেও কিছু ব্যক্তি বিশুদ্ধ সাহিত্যর কথা ভাবেন, পৃষ্ঠপোষকতা করেন এবং তাঁদের যত্নেই সাহিত্য বৃক্ষ ফুলে ফলে সমৃদ্ধ হয়ে উঠেছে এবং উঠবে। আর বাদ বাকি বেশীর ভাগ মানুষকে দেখেছি রাজনৈতিক উগ্রতায় কিংবা সিনেমা'র হিরো হিরোইনদের (হেরোইন 'মাদকদ্রব্য' নয়!) চটকদার আদিরসের আবেদনে প্রবলভাবে আকৃষ্ট ও অন্ধ সমর্থক। অবশ্য সেই রাজনীতিতে এবং সিনেমাতেও সাহিত্য বিদ্যমান সে বিষয়ে নিঃসন্দেহ। রাজনীতির উগ্র সমর্থকগণ বলেন—'আরে মশায়, শুধু সাহিত্য করে/লিখে কি পেট ভরবে? রাজনীতি ছাড়া কি সাহিত্য হয়?' আবার সিনেমার অন্ধ সমর্থকগণ বলেন—'দূর' মশাই, কাহিনী (পুস্তক)-তে না আছে কোন নায়ক—নায়িকার রোমান্টিক ছবি (অর্ধ বিবস্ত্রা!), না রয়েছে কোন স্ট্রং চিত্রনাট্যসহ অপূর্ব কাহিনী সমেত ভায়োলেন্স ও সেক্সের সুড়সুড়ি (তৎসহ অতুলনীয় সঙ্গীত!)—কি হবে, এসব ছাইভস্ম পয়সা খরচ করে পড়ে? কিন্তু অনেকেই বোঝেনা যে সাহিত্য-ই মানুষের জীবনের প্রাণবস্তু। হাত-পা-চোখ-কান থাকলে কি হবে, প্রাণ না থাকলে সবই অচল। মানুষের জীবন থেকে সাহিত্যকে সরিয়ে নেওয়া যায় তা'হলে দেখা যাবে মানুষ অমানুষে পরিণত হচ্ছে!

বাঙালীর সর্বোত্তম আনন্দের প্রহর (শারদোৎসবের) আগমণ। আপনাদের সকলের নিকট আমার একান্ত বিনীত অনুরোধ/নিবেদন যে—(জানানো হচ্ছে)—লেখকের ছবিসহ স্বাক্ষর ছাড়া কেহ-ই পুস্তক ক্রয় করিবেন না। কারণ হচ্ছে—খোলা বাজারে কিছু অসাধু ব্যবসায়ীর (ব্যক্তিরা) অসৎ প্রচেষ্টায় দু'নম্বরী পন্থায় এই পুস্তক বিক্রয়ের রমরমা (ফলাও) ব্যবসা চলছে। লেখকের অকল্পনীয় পরিশ্রম-সততার মূল্য রাখবেন। পাঠক/পাঠিকাদের হস্তে তুলে দিলাম—এই পুস্তকটি। কাহিনীতে কিছু ভুল-ত্রুটী থাকা অসম্ভব নয়—ভুলত্রুটী মার্জনীয়। আপনাদের ভাল লাগলে পরিশ্রম সার্থক হয়েছে বলে মনে করবো। ধন্যবাদান্তে

প্রেম শূণ্য

॥ ১ ॥

নহবতখানায় দরবারী কানাড়া রাগে সানাই বাজছে।

চন্দননগরের চট্টোরাজ পরিবারের চির প্রথানুযায়ী; আজও নহবতখানা তৈরী হয়েছে বিজন চট্টোরাজের আদেশে। হ্যাঁ, বিজনবাবু আদেশ দিয়েছিলেন। স্ত্রী রমলাদেবী যখন বললেন, হ্যাঁ গো, সানাই বাজাবার জন্য তা'হলে 'আশীবাদ রেডিও'তে খবর দাও না? বিজনবাবু তাঁর হাতের ধূমায়মান দামী ইজিপশিয়ান সিগারেটটা এ্যাসট্রেতে গুঁজে দিয়ে বললেন— তার মানে রেকর্ড চালিয়ে সানাই বাজানো? না, রমলা না। ঐতিহ্য বলে একটা কথা আছে। এই চট্টোরাজ পরিবারে চিরকালই নহবত খানা তৈরী হয়ে আসছে, আজও তার ব্যতিক্রম হবে না। আচ্ছা রমলা—তোমার মনে নেই? তুমি যখন এ বাড়ীর বৌ হয়ে এলে তখন কোনখানে নহবতখানা তৈরী হয়েছিল? মনে নেই আবার। ঐ তো গেটে ঢুকতেই ডানদিকে বড় একটা আসর মত তৈরী হয়েছিল। সেখানে বসে পাঁচ ছ'জন মিলে সানাই বাজাচ্ছিল। হ্যাঁ আমার বিয়েতে যেখানে নহবতখানা তৈরী হয়েছিল আমার ছেলের বিয়েতেও সেইখানেই নহবতখানা তৈরী হবে। এই কথার পর নহবত-খানা তৈরী করার জন্য বিজনবাবু আদেশ দিয়েছিলেন। আদেশমত কাজও হয়েছে। কম্পাউণ্ড ঘেরা বিরাট বাড়ীটায় ঢুকেই ঠিক ডানদিকে নহবত-খানা তৈরী হয়েছে। পাঁচ-ছ'জন বায়েনদার সেখানে বসে সানাই বাজাচ্ছে। কখনও মালকোষ রাগে কখনও বা দরবারী কানাড়া রাগে।

গেটে একটা 'তোরণ' তৈরী করা আছে, তাতে নিয়ন আলোয় ইংরেজী বড় হরফে লেখা আছে 'ওয়েলকাম' অবশ্য এখন দিনের বেলায় সেটা জ্বলছেনা রাত্রি হলে বাড়ীটাকে যে ইন্দ্রপুরীর মত দেখাবে সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। গেট দিয়ে প্রবেশ করেই সামনে একটা ছোট্ট কম্পাউণ্ড ঘেরা ফুল বাগান। বাগানের দু'পাশ দিয়ে পিচ বাঁধানো রাস্তা। দু'পাশের রাস্তাকে আপ-ডাউন রাস্তা হিসাবে ব্যবহার করা হয়। বাগান পার হয়ে একটু এগোলেই পড়বে

গাড়ী বারান্দা। সেখানে বিজনবাবুর নিজস্ব সুদৃশ্য ঝক্‌ঝকে ক্যাডিলাক্‌ গাড়ীটা দাঁড়িয়ে আছে, হালকা মেরুন রং-এর গাড়ী। একটা চাকর তোয়ালে দিয়ে গাড়ীর বডিটা পরিষ্কার করছে।

গাড়ী বারান্দা পার হয়ে বাড়ীর ভিতর। অন্দর মহল, বিরাট বাড়ী অগুনতি ঘর অথচ মানুষ এখন মাত্র দু'জন। বিজনবাবু ও তাঁর স্ত্রী রমলা দেবী। অবশ্য চাকর-বাকরেরা আছে প্রায় পাঁচ-ছ'জন, তারা সকলে নীচের ঘরগুলো দখল করে থাকে।

আর তাদের একমাত্র পুত্র-প্রসূন বরাবরই কলকাতার বাড়ীতে—

বিখ্যাত বিজনেস ম্যাগনেট' বিজন চট্টোরাজ অগাধ পয়সার মালিক, চন্দননগরের বসত বাড়ী ছাড়াও কলকাতায় ল্যান্স ডাউন রোডের ওপর একটা বাড়ী। বিজনবাবুর ইচ্ছে এই কলকাতার বাড়ীতে বসবাস শুরু করেন, কিন্তু স্ত্রী রমলা বলেছিলেন—সাত পুরুষের ভিটেমাটি ছেড়ে আমার অন্য কোথাও মন টিকবে না। সুতরাং বিজনবাবুর আর ল্যান্স ডাউন রোডের বাড়ীতে বাস করা হয়নি। তবে তাঁর একমাত্র পুত্র প্রসূনকে তিনি পাঠালেন কলকাতার বাড়ীতে থেকে পড়াশুনা করার জন্য। সেখানেও চাকর-বাকর সবই আছে। এমন কি পুত্রের জন্য একটা কনভার্টিবল বুইক গাড়ী কিনে দিয়েছেন—ড্রাইভারও আছে। তবে প্রসূনও মাঝে মধ্যে নিজেই ড্রাইভ করে। চন্দননগরের বাড়ীতে বিজনবাবু থাকেন।

সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠে একখানা ঘর পার হলেই বিজনবাবুর ঘর, এতক্ষণ তিনি বারান্দায় পায়চারি করছিলেন। একটা চিঠি তাঁকে অস্থির করে তুলেছে। নির্জন বারান্দায় দাঁড়িয়ে ঘন ঘন সিগারেট টান দিচ্ছেন। কখনও বা অস্থিরভাবে পায়চারি করছেন। আজ প্রসূন নববধূ নিয়ে এ বাড়ীতে আসবে। প্রীতি ভোজের ব্যবস্থা আগামী পরশুদিন। আজ বধূ বরনের জন্য সমস্ত আয়োজন সম্পূর্ণ। তবু বিজনবাবু আগত ব্যাপারটাকে একটা আশংকাজনক ব্যপার বলে মনে করছেন। প্রসূনের চিঠিতে একটা অস্পষ্ট ইঙ্গিত আছে। হাতে সিগারেটটায় একটা শেষ টান দিয়ে সেটা বারান্দায় দাঁড় করানো একটা ভেনাস মূর্ত্তির এ্যাসট্রেতে ফেলে দিয়ে দরজার ভেলভেটের পর্দা সরিয়ে ঘরে প্রবেশ করেন। পরিষ্কার কার্পেট পাতা বড় ঘর। ঘাসের চপ্পল পায়ে নিঃশব্দে ঘরের মধ্যে ঘোরাফেরা করছেন। হঠাৎ থম্‌কে দাঁড়ালেন। তারপর টেবিলের ড্রয়ার থেকে সেই চিঠিটা আবার

বার করলেন। সেটা গত পরশুদিন ডাকযোগে এসেছে। কলকাতা থেকে প্রসূন লিখেছে। এই চিঠি বিজনবাবুকে সব কাজের মধ্যে ক'দিন উদ্‌বিগ্ন রেখেছে। মনকে করেছে বিচলিত। সব কিছুর মধ্যে একটা 'কিন্তু' বিজন বাবুকে খুব চিন্তান্বিত করেছে। তাই আবার তিনি চিঠিটা খুলে পড়তে লাগলেন।"............ ..আমি জানি, আমাকে নিয়ে আপনার এবং মা'এর যত সাধ-সাধনা-স্বপ্ন। কিন্তু বিশ্বাস করুন, এছাড়া আমার কোন উপায় ছিল না। আপনার মান-সম্মান, বংশ মর্য্যাদার ঐতিহ্য, এসবকে আমি যেমন অস্বীকার করিনা তেমনি 'মালবিকা'কে ছাড়া আমার জীবন আমি ভাবতেও পারিনা। তাই মালবিকা'র মত একজন অসহায়াকে তথা আমাদের ভালো-বাসাকে না কাঁদিয়ে আমি ওকে গতকাল গন্ধর্ব মতে বিবাহ করেছি।

মালবিকার পরিচয় জানার জন্য আপনি হয়তো উদবিগ্ন হবেন। ঐ বিষয়ে বলি, সে একটা মানুষ এটাই তার বড় পরিচয়। আর আপনি নিশ্চয় জানেন আমি জাতি ধর্ম্মকে মানবিকতার উপরে স্থান দিই না। এবার আপনি যদি মালবিকাকে আপনার পুত্র বধূ হিসেবে স্বীকৃতি দিতে প্রস্তুত থাকেন তবে আগামী দশ-ই মার্চ বুধবার দিন বধূবরনের সমস্ত আয়োজন করবেন, অন্যথায় আমরা গাছতলা বেছে নেব। চিঠির সমস্ত বিষয় মাকে জানাইবেন। ইতি—

আর্শীবাদাকাঙ্খী 'প্রসূন'।

বিজনবাবু চিঠি পাওয়া মাত্রই চটে গিয়েছিলেন, রাগারাগি করে বাড়ী মাথায় করেছিলেন। তাঁর মান-সম্মান সব যাবার আশংকায় তিনি রাগে অগ্নিশর্মা হয়েছিলেন। চিঠি মেঝেতে ফেলে দিয়ে বলেছিলেন—না না আমি এ বিয়ে কোন মতে মেনে নেব না। রাস্কেলটার এতদূর স্পর্ধা এধরনের চিঠি লিখে পাঠিয়েছে আমার কাছে? এ বাড়ীতে স্থান হবে না। গাছ তলাতেই থাকতে হবে তোমাদের। বিজনবাবু রাগান্বিত হলেও মা রমলাদেবী কোমল হৃদয়া। একমাত্র পুত্রের অনেক অপরাধ তিনি ক্ষমার চোখে দেখেছেন। আজ চিঠির বিষয় শুনে তিনি হঠাৎ রেগে না গিয়ে সমস্ত ব্যাপারটাকে সহজভাবে নিতে চেয়েছিলেন, স্বামীকে বুঝিয়ে টুঝিয়ে বলে প্রসূনের কথা-মতো আজকে বধূবরনের সব ব্যবস্থা করিয়েছেন। তিনি হৃষ্টচিত্তে সকাল সকাল স্নান সেরে লালপেড়ে গরদের শাড়ী পরে গৃহদেবতার পূজা শেষ করে এখন ছেলে-বৌ-এর অপেক্ষায় আছেন। পুত্রের মঙ্গল কামনায় যেন

ধ্যানস্থা। কপালে বড় গোলাকার সিঁদুরের টিপ। গা ভর্ত্তি সোনার গহনা গলায় মোহন মালা, তাগা, হাতে বাঁশগিঁটের বালা। সবমিলিয়ে যেন আর এক দেবীপ্রতিমা, কিন্তু বিজনবাবু তাঁর আভিজাত্যের অহংকারে ভাটা পড়ার ভয়ে শংকিত। ঘরের মধ্যে সেই চিঠিটা হাতে নিয়ে তখনও স্থাণুর মত দাঁড়িয়ে আছেন। মৃদুস্বরে সানাই বেজে চলেছে—

॥ ২ ॥

ফুলে ফুলে সাজানো কনভার্টিবল গাড়ীটা এসে বারান্দার নীচে দাঁড়িয়েছে। গাড়ীটাকে ঘিরে অনেক নারী-পুরুষ, তবে যুবতীদের সংখ্যাই বেশী, কারণ এ বিষয়ে যুবতীরাই বেশী কৌতূহলী। সকলের মুখে এককথা—"বৌ এসেছে।" তবে অনেকে বলাবলি করছে—"বৌ তো এল! বিয়ে কবে হ'ল?"

রমলাদেবী আসছেন। সকলে তাকে পথ করে দিচ্ছে। গাড়ীর নিকট এসে রমলাদেবী দাঁড়ালেন। ড্রাইভার দরজা খুলে দিল। গাড়ী থেকে নেমে এল বর বেশে প্রসূন, কনে বেশে মালবিকা। রমলাদেবীকে ওরা দু'জনেই পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করলো। ইতিমধ্যে দেখা গেল দু-চারজন কানাকানি করছে। কোথাও বা জটলা পাকিয়ে কিছু আলোচনা হচ্ছে।

রমলাদেবী মালবিকা'র (পুত্রবধূ) হাত ধরে ভিতরে নিয়ে চললেন। প্রসূন পিছনে হাঁটছে। তার পিছু পিছু কিছু ছেলে মেয়ে কৌতূহলী মানুষ। হঠাৎ পিছন থেকে একটা পুরুষকণ্ঠে শোনা গেল—আর যাই হোক অভিনয় করতো বটে?

কথাটা শুনেই মালবিকা থমকে দাঁড়াল। প্রসূনও শুনেছে কথাটা। কিন্তু শুনলেই বা কি করতে পারে! কথাটা সত্যি, আর সত্যি মালবিকা। সত্যি-ই তাদের ভালোবাসা, আর এই বিবাহ। কোনটাই মিথ্যে নয়। সুতরাং প্রসূন এখন ঠিক কি করবে নিজেই ভেবে পায় না। মালবিকাও আসন্ন অবস্থার জন্য ভীত সন্ত্রস্তা। মালবিকা স্থাণুর মত দাঁড়িয়ে পড়তেই রমলাদেবী স্মিত হাস্যে বললেন—থামলে কেন মা?—এসো।

রমলাদেবীর ডাক শুনে মালবিকা সম্বিৎ ফিরে পেল। 'মা' সম্বোধন শুনে মালবিকার অন্তর্দ্বন্দ্বে ক্ষত-বিক্ষত হৃদয়ে যেন শীতল প্রবাহ বয়ে গেল। মালবিকা আবার চলতে শুরু করলো। গাড়ী বারান্দা পার হয়ে বিরাট আঙ্গিনা। যেখানে পাতা আছে দুটো কাঠের পিঁড়ি। উপরে টাঙ্গানো

রয়েছে চাঁদোয়া। রমলা'দেবী নববধূ মালবিকাকে পিঁড়িতে তুলে দিয়ে 'হারা' নাম্নী এক চাকরানীকে আদেশ করলেন—'হারা, বরন ডালাটা নিয়ে আয়—শাঁখ বাজা।'

বধূবরণের জন্য মায়ের ব্যস্ততা দেখে প্রসূন আশ্বস্ত হল। মা মালবিকাকে সাদরে বরণ করে নিতে প্রস্তুত। কিন্তু বাবাকে দেখতে না পেয়ে প্রসূন সামান্য চিন্তিত। তবে কি, 'বাবা মালবিকাকে মেনে নিতে রাজী নয়'? তিনি তো এখনও এলেন না।

বিজনবাবু একদৃষ্টে নববধূর মুখের পানে তাকিয়ে ছিলেন। কোন একটা মুখের সঙ্গে যেন মিল আছে ঐ নববধুর মুখের। হঠাৎ তিনি কখন যে ভীড়ের মধ্যে পায়ে পায়ে নিজের ঘরে চলে গেছেন কেহ-ই তা টের পায় নি। নিজের ঘরের মধ্যে প্রবেশ করে বই'র আলমারী খুললেন। নানান পুস্তক ও পত্রিকার মাঝে কি যেন খুঁজতে ব্যগ্র হলেন।

এদিকে 'হারা' বরণডালা এনে হাজির, শাঁখ বাজছে। মঙ্গল ধ্বনিতে সমস্ত বাড়ী মুখরিত। বধূবরণের জন্য রমলাদেবী বরণ শুরু করেছে। এমন সময় ওপরের ঝুল বারান্দা থেকে বিজনবাবু বজ্রনাদ করলেন। বললেন রমলা, বরণ বন্ধ করো! বিজনবাবুর হুংকার সবাই শুনেছে। চাকরেরা সকলেই ভয় পেয়েছে। কর্তাবাবু চিৎকার করে চলেছেন। রেগে গেছেন। কিন্তু কেন? অনেকে বুঝতে পেরেছে। অনেকে পারেনি। প্রসূন জানতে পারলো। কিন্তু নির্বাক হয়ে রইল। মালবিকা ভয়ার্ত চোখে প্রসূনের পানে তাকাল, কিন্তু আশ্বাসের কোন ইঙ্গিত পেল না। মালবিকা আরও ভয় পেল, মাথা নীচু করল। কিন্তু অন্যান্য সকলে ঝুল বারান্দার পানে তাকিয়ে আছে। বিজনবাবু তর্জ্জনী তুলে বরণ করতে নিষেধ করছেন। সমস্ত বাড়ীটা স্তম্ভিত বিস্ময়ে যেন এবার মালবিকাকে দেখছে। নববধূ সম্পর্কে তাদের 'কৌতূহল' আরো বেড়ে গিয়েছে। তারা জানে, এই চট্টোরাজ পরিবারের রীতি-নীতি। ভালোবেসে বিয়ে যদিও চলে, তবে মেয়ে যদি অজ্ঞাত কুলশীলা হয়, সে বিয়ে কোনমতে নয়। চট্টোরাজ পরিবারের প্রাণের চেয়েও বংশ মর্য্যাদা অনেক বড়। সবাই দেখলো, বিজনবাবু সিঁড়ি দিয়ে নামছেন। চোখে মুখে কঠোরতার ছাপ, বিজনবাবু এবার সোজা মালবিকার কাছে চলে এলেন। বললেন—'এই চট্টোরাজ পরিবারটা রঙ্গমঞ্চ নয়, এখানে অভিনয় চলে না।' মালবিকা থর থর করে কাঁপছে।

প্রসূন তার বাবাকে বাধা দিতে গিয়েও পারলো না। সংকোচ এসে তার কণ্ঠরোধ করলো। হাতে পায়ে দড়ি বেঁধে দিয়ে গেল।

রমলাদেবী বিস্ময়ে বলে ওঠেন কি, বলছো তুমি ?

কোন কথা না বলে বিজনবাবু ছড়িটা দিয়ে বরণডালায় আঘাত করলেন।

রমলাদেবীর হাত থেকে বরণডালাটা মাটিতে পড়ে গেল। তিনি এসবের কিছু বুঝতে না পেরে বলেন এ, কি ! তুমি বরণডালা ফেলে দিলে ?

—হ্যাঁ দিলাম ! কারণ বরণ হবে না। একটা অভিনেত্রীকে আমি পুত্রবধূ বলে মেনে নিতে পারবো না।

—কিন্তু, বাবা—

থামো ! ধমক দিয়ে প্রসূনকে থামিয়ে বিজনবাবু বলেন তোমার উপর আস্থা ছিল। তুমি এমন কিছু গর্হিত কাজ করবে না যাতে আমাদের বংশ মর্যাদা ক্ষুন্ন হয়। আমাদের চট্টোরাজ পরিবারে কলংক স্পর্শ করে। আর আজ তুমি আমার সমস্ত বিশ্বাসকে—

আমিতো চিঠিতে জানিয়ে ছিলাম। মালবিকাকে ছাড়া আমার জীবন অসম্ভব। —হ্যাঁ, তা জানিয়েছিলে। কিন্তু এটা জানাও নি যে একটা ম্লেচ্ছকে তুমি বিয়ে করেছ ?

—বাবা।

এতক্ষণ একজন প্রতিবেশী বৃদ্ধা মালবিকাকে অন্যভাবে আবিষ্কার করছিলেন। মালবিকার নারী শরীরের অব্যক্ত ভাষা বৃদ্ধার চোখে ধরা পড়ল। মালবিকার নিতম্বের সামান্য ব্যাপ্তি; মালবিকার শরীরে যে কুমারীত্ব ছাড়িয়ে মাতৃত্বের জোয়ার এসেছে তা বৃদ্ধার চোখে এড়িয়ে যায় নি। অনেকক্ষন দেখার পর বৃদ্ধা বললেন,—"হ্যাঁরে রমলা, তোর ব্যাটা শেষকালে একটা পোয়াতি মেয়েকে বে' করে ঘরে আনলো ?"

সঙ্গে সঙ্গেই মালবিকার সর্বাঙ্গ গুলিয়ে উঠলো। চোখে সে অন্ধকার দেখে। কোন রকমে নিজেকে সামলে নিল। প্রসূনের পানে সকরুণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল। তার মুখের নিরুদ্ধ ভাষা চোখ দিয়ে বেরিয়ে আসছে। "প্রসূন, তুমি সমাজের ভয়ে এটাকে স্বীকার করতে পারছো না। প্রসূন তুমি চুপ করে থেক না একটা কিছু বল-ও প্রসূন তুমি কি নিষ্প্রাণ পাথর হয়েই থাকবে ? কিছু বলবে না ?"

চাপা কান্নায় মালবিকা ভেঙ্গে পড়ল। প্রসূন তাকে ধরতে গেল।

কিন্তু রমলাদেবী বাধা দিলেন। ঈষৎ চোখ রাঙ্গিয়ে বললেন—'প্রসূন, ওর গায়ে হাত দিবি না।' মা তুমি ঠিক বুঝছোনা বুঝতে পারছোনা—

তোকে আর বোঝাতে হবে না। একটা নষ্ট মেয়েকে বিয়ে করে এনে বংশের মুখে কালি দিয়ে আবার কোন সাহসে কথা বলতে আসিস আমার সাথে? মালবিকা আর দাঁড়িয়ে থাকতে পারে না। শরীরের সমস্ত স্নায়ুগুলো দুর্ব্বল হয়ে গেল। মালবিকা মাটিতে পড়ে গেল। প্রসূন তাকে ধরতে গেল। কিন্তু আবার বাধা দিলেন তাঁর মা রমলাদেবী।

প্রসূন বলল—মা, ওর মাথা ঘুরে পড়ে গেছে, ওর মাথায় জল দিতে হবে, তুমি আমায় ছাড়! প্রসূন চেষ্টা করেও মায়ের হাত ছাড়িয়ে নিতে পারল না।

রমলাদেবী প্রসূনের হাত ধরে টান দিলেন। টান পড়লো গাঁট ছড়ায়। বৃদ্ধ চাকর রঘুকে আদেশ করলেন—'রঘু, গাঁট ছড়াটা খুলে দে?

পুরানো ভৃত্য, সবই শুনেছে। সবই জেনেছে—তবু কর্তামায়ের আদেশ রঘুর কাছে অকল্পনীয়! তাই অবাক হয়ে বলল মা?

—কি হল? যা বললাম কর!

—মা বলেন তো গাঙের জলে ঝাঁপ দিয়ে মরি। তবুও এই কাজ আমি পারবুনি মা। রমলাদেবী বুঝলেন—এ, রঘুর কাজ নয়। তাই নিজে হাতে গাঁট ছড়াটা ছিঁড়ে ফেললেন!

প্রসূন বাধা দিতে গিয়েও পারলো না। মনে মনে বলল মেয়েমানুষের সবচেয়ে বড় শত্রু মেয়েমানুষ। তারপর বলল—রঘুদা একটু জল আনো। রঘু জল আনতে চলে গেল—।

বিজনবাবু প্রসূনকে স্পষ্ট জানিয়ে দিলেন যে তোমার জন্য দুটো পথ খোলা আছে। ঐ মেয়েকে নিয়ে যদি সংসার করতে চাও তবে, এই চট্টোরাজ পরিবারে কোন স্থান নেই। আর ওকে ত্যাগ করলে তুমি আমার সামনে আসবে! কথাগুলো বলে বিজনবাবু সোজা উপরে চলে গেলেন। মালবিকার যখন জ্ঞান হল দেখলো সামনে কেহ-ই নেই। দূরে বরণডালাটা পড়ে রয়েছে। প্রদীপটা নিভে গেছে। মালবিকা উঠে দাঁড়াল। মুহূর্তে মালবিকার কাছে সমস্ত কিছু মিথ্যা হয়ে গেল। এতদিনকার যে পৃথিবীটাকে সে চিনতো ও জানতো, যে পৃথিবীটা এতদিন শুধু আনন্দের ছিল; আজ সেটা কেমন যেন অচেনা, অজানা। এক লহমায় যেন শুধু দুঃখের মূর্ত্তি

হয়ে গেল। মনে হল জীবনটাই মিথ্যা। সব-সমস্ত কিছু মিথ্যা অর্থহীন। কিন্তু তার যৌবনোর্ব্বর শোনিতে যে প্রাণের বীজ সন্তরণ করছে, না-না মালবিকা এটাকে অস্বীকার করতে পারবে কি করে? এটাকে মিথ্যা ভাবতে পারে না। এটা চিরন্তন সত্য, নির্মম সত্য। তবু প্রসূন-ই এই সত্যটাকে স্বীকার করল না। সমাজের ভয়ে এটাকে মেনে নিল না। এতদিন কোন শাসন না মেনে, বিবেকের নির্দেশ না মেনে প্রায় স্বেচ্ছাচারিতার মধ্য দিয়ে দিন কাটিয়ে একটা স্বাধীন বেপরোয়া ধরণের হয়েছিল। কিন্তু কোনদিন ভাবেনি যে এসব কিছুর জন্য মূল্য দিতে হবে। একটা নারী দেহকে ভোগ করতে হলে, পরে সমাজের কাছে জবাব দিতে হবে। বিশেষ করে মালবিকাকেই একদিন জবাব দিতে হবে এটাও প্রসূন কোনদিন ভাবেনি।

কিছুক্ষন পরে রঘু জল আনতে গেল-বলল-'বৌদিমনি জল খাবে'?

মালবিকা সম্মতি সূচক মাথা নাড়লো।

রঘু বলল-দাদাবাবু ডাক্তার আনতে গেছেন, আপনি এখেনে বসুন,—জল আনতে চলে গেল। মালবিকা চারিদিকে তাকিয়ে দেখলো-আশ্চর্য! কিছুক্ষণ পূর্বে এই বাড়ীটায় কত লোকজন অথচ এখন যেন মরুভূমি, সবাই মালবিকাকে প্রত্যাখান করেছে। প্রসূনও করেছে। মালবিকার নারীত্বের চরম অপমান করেছে। সমাজে নিজের মুখ রাখতে মালবিকার নারীসত্বার ওপর কসাই'-এর ন্যায় নিষ্ঠুরভাবে ছুরি চালিয়েছে। বিয়ের পূর্বে যে নারী প্রসূনের কাছে এসে প্রসূনের জীবনকে অনাবিল আনন্দে ভরিয়ে দিয়েছে, যে নারী বিশ্বাস করে তার যৌবন দান করেছে—প্রসূনকে স্বামী ভেবে যে নারী তার কুমারীত্ব বিসর্জন দিয়েছে, সেই নারীকে—অর্থাৎ সেই মালবিকাকে প্রসূন আজ একবাড়ী লোকের মাঝে কলংকের মাঝে একা ফেলে রেখে গেল। নিজের কৃতকর্মটাকে প্রসূন মেনে নিলনা। উপরন্তু সেই মালবিকার সমস্ত লজ্জাকে প্রসূন কৃতঘ্নের মত মসিলিপ্ত করে দিল। না, মালবিকা আর এক মুহূর্ত এখানে থাকবে না। যে মানুষ তার এতখানি দানের 'প্রতিদান' না দিয়ে পরিবর্তে তাকে সমাজের কাছে কঠিন জিঘাংসাতে পরিণত করলো, সে মানুষের কাছে, সে সমাজের কাছে মালবিকা এক মুহূর্ত থাকবে না। মালবিকা আর একবার চারিদিকে ভালো করে দেখলো-কেহ নেই, কেউ এলনা। এত বড় বাড়ীটায় কেহ নেই যে মালবিকার

সমবেদনায় একটু অশ্রু ফেলবে। চট্টোরাজ পরিবারটাই যেন নিরেট পাথর নিস্প্রাণ। এখানে মালবিকার অধিকার প্রতিষ্ঠা হলেও 'শান্তি' পাওয়া সম্ভব নয়—একটা বিরাট শূণ্যতা মালবিকাকে ঘিরে ধরেছে। আজীবন এই শূণ্যতার মধ্যে দিয়ে শুধু অপমান, ব্যর্থতা আর অগৌরব নিয়ে বেঁচে থাকতে মালবিকার মন চাইল না। বরণ কালের সমস্ত ঘটনাবলী, কার্শিয়াং এর ঘটনাবলী মালবিকার মনকে, চোখের দৃষ্টিকে সজল করে দিল। আর কি লাভ, এ জীবনের ক্লেদাক্ত ইতিহাস সৃষ্টি করে? এখানে বেঁচে থাকাটা অন্ততঃ মালবিকার পক্ষে একটা নিষ্ফল প্রয়াস মাত্র। মালবিকার চোখে মুখে দৃঢ় সংকল্পের ছাপ দেখা গেল। সে তার পথ খুঁজে পেয়েছে। সে পথে মালবিকা পা বাড়াবেই!

॥ ৩ ॥

ভারাক্রান্ত মন নিয়ে প্রসূন সমস্ত দিনটা ঘরেই কাটিয়ে দিল। পুরানো স্মৃতির মর্মপীড়ায় জরজর। ইচ্ছায় অনিচ্ছায় শুধু মালবিকাকেই তার মনে পড়ছে। বরণকালের সেই সকরুণ মুখখানি বেদনায় পাংশু বর্ণ ধারন করেছিল। এখনও প্রসূনের মনে পড়ছে মালবিকার মুখের সেই নিরুদ্ধ ভাষা যেন প্রসূন কেই ধিক্কার দিচ্ছিল। মালবিকা যেন প্রসূনকে বলছিল,- বর্ষনমুখর রাতের সেই মূঢ়তার সময় বিষাক্ত সাপের বিষ আমার দেহ থেকে তুলে আমাকে মুক্ত করেছিলে। কিন্তু আজ তোমার নিজের বিষ তুলে তুমি নিতে পারলেনা কেন? তোমার বিষ আমার সমস্ত শরীরকে জর্জরিত করেছে। এ থেকে আমায় মুক্তি দিতে পারলেনা কেন?

এমনিভাবে মালবিকাকে চিন্তা করতে করতে কখন যে রাত হয়ে গেছে প্রসূন জানতেও পারেনি।

রাত্রিতে সমস্ত বাড়ী যখন গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন তখন প্রসূন একটা এ্যাটাচীতে কিছু পোষাক আর মালবিকার একটা ছবি নিয়ে বাড়ী থেকে বেরিয়ে এল. কেউ জানতে পারল না। চন্দননগর থেকে লোকাল ট্রেনে বর্দ্ধমান, তারপর মেলট্রেন—রাত্রি এগারটা বাজলো। ট্রেনের অন্যান্য যাত্রীদের অনেকেই ঘুমিয়ে পড়েছে। প্রসূন ঘুমায়নি। ঘুমোতে পারেনি। ব্যর্থতার গ্লানি অক্ষমতার কলংক প্রসূনকে ঘুমোতে দেয় নি। বরং কতকগুলো পুরোন উজ্জ্বল স্মৃতি প্রসূনের চোখের সামনে মনের পর্দায় ছবির মত ফুটে উঠলো।

॥ ৪ ॥

ধনী বাপের একমাত্র ছেলে প্রসূন।

কলকাতার ল্যান্স ডাউন রোডের বাড়ীতে থেকে পড়াশুনা করে। কিন্তু সাধরনতঃ কলেজের কোন ছাত্রীকে ভাল না বেসে প্রসূন ভালো বেসেছিল এক 'অভিনেত্রী' কে।

—হ্যাঁ, মালবিকা কলকাতা'রই একটি রঙ্গমঞ্চে নিয়মিত অভিনয় করতো। একদিন 'শো' শেষ করে বাড়ী ফিরছে। কিছুক্ষন্ আগে এক পশলা বৃষ্টি হয়ে গেছে। একটানা তিনঘণ্টা অভিনয়ের পর এই জলকাদায় ট্রাম বা বাসের প্রচণ্ড ভীড়ের মধ্যে যেতে ভাল লাগল না। অথচ এমন অর্থ রোজগার (উপার্জন) করে না যে প্রতিদিন ট্যাক্সি চাপবে। তাছাড়া আজ ভ্যাপ্সা গরমের মধ্যে এই বৃষ্টি ভেজা আবহাওয়ায় মালবিকার হাঁটতে ইচ্ছা করল। রাত প্রায় দশটা, সার্কুলার রোড ধরে মালবিকা হেঁটে চলেছে। হঠাৎ কি ভাবে যেন মালবিকা পা পিছলে ফুটপাত থেকে রাস্তায় নেমে পড়ল। অনেক কষ্টে নিজেকে সামলে নিল। পিছনে তাকাতেই একটা ট্যাক্সির হেডলাইটের তীক্ষ্ণ আলোয় মালবিকার চোখ ধাঁধিয়ে গেল। রাস্তার জল বাঁচিয়ে ট্যাক্সীটা একটু ফুটপাত ঘেঁসেই আসছিল। মালবিকা হঠাৎ রাস্তায় নেমে পড়ায় একটা বিচিত্র আওয়াজ তুলে ট্যাক্সীটা ঠিক মালবিকার পিছনে দাঁড়িয়ে গেল। ট্যাক্সী আর মালবিকার ব্যবধান দু'হাত। কপালের সামনে হাতের আড়াল দিয়ে আলোর তীব্রতা থেকে নিজের চোখকে বাঁচিয়ে মালবিকা গাড়ীর চালককে দেখবার চেষ্টা করল। বলল—কিছু মনে করবেন না (Don't Mind) হঠাৎ পা-পিছলে গিয়ে·····

হেডলাইটের আলো নিস্তেজ হল। চালক মালবিকাকে চিনতে পেরেছিল।

মালবিকা পাশে সরে গিয়ে শাড়ীর কাদা জল ঝেড়ে নিচ্ছে।

—দোষ শুধু আপনার নয়, আমারও! মিষ্টি অথচ গম্ভীর কণ্ঠস্বর শুনে মালবিকা চম্‌কে ফিরে তাকাল, দেখলো—উক্ত ব্যক্তি গাড়ীর জানালা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে আছে। একজন যুবক বয়স কুড়ি-পঁচিশের মধ্যে সীমাবদ্ধ। রাজকীয় বলিষ্ঠ চেহারা, পরনে আকাশ-নীল রঙের ট্রপিক্যাল লংস গায়ে একটি হাওয়াই শার্ট, বুকখোলা। লোমশ বুকটা দেখা যাচ্ছে। মাথায় ট্যুরার ক্যাপ—আবছা আলোয় বোঝা যায় যুবক বেশ রূপবান। যুবক

তখনো মালবিকার পানে তাকিয়ে আছে। মালবিকা যুবকের পানে তাকিয়ে ভ্রূ-কুঁচকে বলল—কেন?

—কারণ,—এতখানি ফুটপাত ঘেঁসে গাড়ী চালানো আমার উচিত হয়নি। তবুও আপনি আপনার রাস্তাতেই আছেন। আমি বরং ফুটপাত ছেড়ে রাস্তায় নেমে পড়েছিলাম।

—আহা-হা, সে তো আপনি ইচ্ছা করে নামেন নি।

—আপনিও তো কাদাজল থেকে বাঁচাতে গাড়ী ফুটপাত ঘেঁসে চালাচ্ছিলেন। ইচ্ছে করে নয় নিশ্চয়ই? তা'হলে দু'জনেই কি দৈবক্রমে······

—যুবকের কথা শুনে মালবিকার হাসি পেল। কিন্তু না হেসে কি যেন চিন্তা করতে লাগল। যুবতীকে (মালবিকাকে) অবসর না দিয়ে বলল—চিন্তা করতে হবে না। নিন, উঠে পড়ুন—আপনার গন্তব্যস্থলে পৌঁছে দিচ্ছি।

যুবকের এই অযাচিত উপকার করতে চাওয়াটা মালবিকার কাছে কেমন যেন সন্দেহজনক মনে হল। চেনা নেই জানা নেই! সে ইতস্ততঃ করে বলল-না, না আপনাকে আর কষ্ট······

কষ্ট! যুবক উচ্চস্বরে হেসে উঠলো।

হাসিটা মালবিকার কাছে আরো ভীতিজনক মনে হল।

যুবক বলল-একজন গণ্যমান্য অভিনেত্রীকে তাঁর গন্তব্যস্থলে পৌঁছে দিতে পারলে আমি কিন্তু নিজেকে ধন্য মনে করতাম।

-আপনাকে ধন্য করব আমি? সে সাধ্য কোথায়।

-আছে! আপনার সেবায়··· নিন, দেরী না করে উঠে পড়ুন গাড়ীতে। এমন এক আবদারের সুরে যুবক বলল—যে মালবিকা কথাটা অস্বীকার করতে পারে না। এবং মালবিকা এও বুঝলো যে-যুবক বেশী কথা পছন্দ করে না। মালবিকা একবার আকাশের পানে তাকাল। কোথাও একটাও তারা দেখা গেল না। সমস্ত আকাশে কালো রুদ্রের ছোঁয়া। মালবিকা চিন্তা করছিল যুবকের বিনয়াবর্ত কথাবার্ত্তা শুনে মালবিকার সংশয় দূর হয়। আবার একটা কিন্তু' এমন কন্দর্প কান্তির মনে কোন কুমতলব থাকতে পারে কি? না না মালবিকা যেন নিজেকে নিজেই প্রশ্ন করছে।

—চিন্তা করবেন না ম্যাডাম, কোন—ও ঈভল্ ডুয়ার নই আমি। 'ফর পিওর এ্যাণ্ড সিম্পলহেল্প'—যুবকের কথা শুনে মালবিকা নিজেকে

কেমন যেন দোষী মনে করল। ছিঃ ছিঃ। একটা ভদ্র রুচিবান যুবক সম্পর্কে কি সব আজেবাজে ধারনা করল। হঠাৎ টিপ টিপ বৃষ্টি! মালবিকা যেন বাধ্য হয়েই গাড়ীর মধ্যে উঠে বসলো। পিছনের সীটে মালবিকা। যুবকটি গাড়ী স্টার্ট করে বলল,—বলুন কোথায় নামবেন?

—এখনতো চলুন!

গাড়ী মন্থর গতিতে এগিয়ে চলেছে। ভিউমিররে (View-Mirror) যুবকটি মালবিকাকে চকিতে দেখলো। কিছুক্ষন নির্বাক হয়ে চলল-এই নীরব আবহাওয়া একটু পরেই দু'জনের কাছে কেমন যেন অস্বস্তিকর হয়ে উঠল। স্তব্ধতা কাটিয়ে যুবকটি এক সময় বলল, আচ্ছা আপনি কি শুক্তিমতীর চরিত্রে অভিনয় করেন? না কি শুক্তিমতীর সমস্ত মন-প্রাণ আপনার দেহে বিলীন হয়ে আছে?

মালবিকা মৃদু হেসে বলল—কেন বলুন তো?

—সত্যি আপনার অভিনয়ের তারিফ করতে হয়। নাটক চলাকালীন আপনাকে দেখে মনে হয় আপনি অভিনয় করছেন না। যেন মঞ্চেও আপনি শুক্তিমতীর বাস্তব রূপ! শুক্তিমতীর লজ্জা, সংশয়, গ্লানি অপমান, সব সবকিছুর অভিব্যক্তি আপনার চোখে মুখে এমন নিখুঁতভাবে পরিলক্ষিত হয় যা দেখে মনে হয় না সেটা অভিনয়। মনে হয় আপনারটাই অভিনয়।

মালবিকা একটু বিষন্ন হাসি হাসলো। বলল—'পয়সা যখন নিই সেটা অভিনয় বৈ কি?'—সহসা গাড়ীর স্পীড কমে গেল। মালবিকার কথার মধ্যে একটা ব্যথা অনুভব করে যুবক বলল,—একথা কেন বলছেন? অভিনয় কি আপনার পছন্দ নয়?

—অপছন্দ ঠিক নয়!

—তবে?

—সে, আপনি বুঝবেন না। মালবিকার বুক চিরে একটা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এল।

—আপনার যদি না ভাল লাগে, আপনি ছেড়ে দিন।

—আমি চাইলেই তো হবে না। সকলে আমাকে চায় কিন্তু আমি কি চাই সেটা কেউ বোঝেনা!

—যদি বলি আমি বুঝি?

কি বললেন?

—হ্যাঁ, আমি বুঝি! যুবক গাড়ী থামাল, পিছন ফিরে তাকাল। ব্যাটারীর আলোয় মালবিকার অদ্ভুত জিজ্ঞাসু দৃষ্টির পানে তাকালো।

মালবিকা আবার প্রশ্ন করল—আপনি কি বুঝেছেন?

যুবক: মেয়েরা চায়—স্বামী সংসার, সন্তান। এ্যাম আই র…

গাড়ী আবার চলতে শুরু করল। যুবকের কথাগুলো মালবিকার বুকে বিঁধলো। বলল—কিন্তু সমাজ তা হতে দিচ্ছে না। আমরা নটী, আমাদের ওসব স্বপ্ন দেখাও নাকি পাপ! যুবক অবজ্ঞার হাসি হেসে বলল,—'দেখুন ঐ পাপ-পূণ্য কথাগুলো আমি বিশ্বাস করি না।' মানিকতলার কাছে একটা চিরপরিচিত জায়গা দেখে মালবিকা হঠাৎ বলল—ডানদিকে গাড়ী ঘোরান তারপর কিছুক্ষণ গিয়ে একটা সরুগলির কাছে গাড়ী থামাতে বলল।

যুবক বলল—কেন?

—আমি এখানেই থাকি।

তা এখানে কেন? চলুন বাড়ীর কাছে পৌছে দিই।

—ধন্যবাদ। আপনার গাড়ী ঐ সরুগলির মধ্যে ঢুকবেনা। মালবিকা গাড়ী থেকে নামল, বৃষ্টি এখন থেমে গেছে। মালবিকা গৃহাভিমুখে হয়েও ফিরে তাকিয়ে বলল—ও; আপনার পরিচয় নেওয়া হল না দেখেছেন কেমন ভুলো মন?

—আমার আবার পরিচয়! যুবক হাসলো।

—হাসলেন যে?

—হাসবো না? আমার আর কি পরিচয় থাকতে পারে?

—নিশ্চয়ই আছে, আপনার নাম ধাম—

—হ্যাঁ তা আছে বটে! তবে কি জানেন ঐ বাবা-মার দেওয়া পরিচয় গুলো দিয়ে কোন কৃতিত্ব অর্জন করা যায় না। নিজেকে জীবনে প্রতিষ্ঠিত করে যদি বলতে পারি, আমি অমুক-তমুক-তবেই সেখানে কৃতিত্ব। নচেৎ মা নাম দিয়েছেন—প্রসূন। আর বাবার টু-পাইস হ্যাজ, সেইজন্য আমি অমুকের অমুক, এসব বলে ঠিক গৌরব অর্জন করা যায় না।

কথা শুনতে শুনতে মালবিকা মৃদু হাসলো। বলল—জানলাম আপনার নাম—'প্রসূন'। কিন্তু প্রসূন বাবু আপনার সারনেম অর্থাৎ পদবী কি?

—চট্টোরাজ।

—আচ্ছা অনেক ধন্যবাদ আবার দেখা হবে 'গুড নাইট' চলি।

—ও কে বাই···

মালবিকা একটা আবছা আলো আঁধারি গলির মধ্যে প্রবেশ করল। প্রসূন তার ক্রমঅপসৃয়মান দেহটার পানে তাকিয়ে রইল।

॥ ৫ ॥

গাড়ী ভিক্টোরিয়া অভিমুখে চলেছে।

কি একটা কথা প্রসঙ্গে সেদিন প্রসূন মালবিকাকে জিজ্ঞাসা করলো—আপনার বাড়ীতে আর কেউ নেই?

মালবিকা বলল—নাঃ কেহ নেই মানিকতলার ওখানে ঘর ভাড়া নিয়ে থাকি।

—আপনার মা বাবা··· ?

—কেহ নেই। জ্ঞান হতে জানি আমি অনাথ আশ্রমে মানুষ হয়েছি।

—আশ্রমে? প্রসূনের বিস্ময়ের অবকাশ (অবধি) থাকে না।

—হ্যাঁ, প্রসূনবাবু। বাবা-মায়ের স্নেহ মায়া মমতা কেমন জিনিষ আমি তার বিন্দুমাত্র স্বাদ পাইনি। আজ এই অভিনয় জীবনে হয়তো অনেক যশ মান-সম্মান পেযেছি কিন্তু এ ধরনের সম্মান মেয়েদের কাছে কলঙ্ক ছাড়া আর কি?

—প্রসূন নিরুত্তর, নিশ্চল পাথরের মত ষ্টীয়ারিং হুইলের উপর হাত রেখে বসে আছে। গাড়ী মন্থর গতিতে চৌরঙ্গী রোড ধরে এগিয়ে চলেছে। হঠাৎ মালবিকা চিৎকার করে ওঠে,—প্রসূনবাবু······

মালবিকার চীৎকারে প্রসূন হঠাৎ সম্বিৎ ফিরে পেয়ে সজোরে ব্রেক কষলো। মাটির সঙ্গে চাকার ঘর্ষণ জনিত বিচিত্র আওয়াজ করে গাড়ীটা থেমে গেল। সামনে একটা বাচ্চা ছেলে এসে পড়েছিল। মালবিকা যদি প্রসূনকে সাবধানে না করতো প্রসূন যদি গাড়ী না থামাতো তবে একটা বিপদ এখনই ঘটে যেত। একজন পথচারী বাচ্চাটাকে সরিয়ে নিয়ে গেল। বাচ্চাটাকে ধমকে দিল। প্রসূন পুনরায় এ্যাক্সেলেটারে চাপ দিল। গাড়ী চলতে শুরু করল। প্রসূন অত্যন্ত কৃতজ্ঞতাভরা কণ্ঠে বলল—আপনার কথা শুনতে শুনতে আমি অন্যমনস্ক হয়েছিলাম, কি ভাগ্যি আপনি সাবধান করে দিলেন।

মালবিকা বলল—জানেন প্রসূনবাবু, আমার জীবনেও ঠিক এমনটি

ঘটেছিল। যে ড্রাইভার গাড়ী চালাচ্ছিল—সেই আমাকে অনাথ আশ্রমে রেখে দিয়েছিল। আমি সেখানেই বড় হয়েছি। তারপর পেটের ধান্দা করতে করতে গান শিখলাম। সেই সূত্র ধরেই অভিনয় জগতে প্রবেশ। এখন মনে হয় সেদিন যদি গাড়ী চাপা পড়ে মরতাম, তাহলে বোধহয় ভাল হ'তো। মালবিকার বুক ফেটে যেন একটা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এল। প্রসূন বুঝতে পারলো মালবিকার বুকের মাঝে কোথায় একটা জমাট ব্যথার পাহাড় আছে। ভিক্টোরিয়ার সামনে আসতেই প্রসূন গাড়ী থামিয়ে বলল,—চলুন ঐ মাঠে ঘাসের ওপর বসা যাক।

প্রসূনের প্রস্তাবে মালবিকা রাজী হয়ে গিয়ে গাড়ী থেকে নামলো। তার মনে এল, তার দুঃখময় জীবনের পাঁচালী শোনাবার সাথী পেয়েছে। মনে হল তার দুঃখে সমব্যথী হবে প্রসূন।

গাড়ী থেকে নেমে ওরা দু'জন পাশাপাশি হেঁটে চললো। সামান্য ব্যবধান রেখে। সন্ধ্যা প্রায় ঘনিয়ে এসেছে। এ সময় ভিক্টোরিয়া প্যালেস'টা বেশ মনোরম দেখায়। নীল আকাশের গায়ে মাঝে মধ্যে শরতের সাদা মেঘের দল ছোটাছুটি করছে। মনে হয় যেন কতগুলো পেঁজা তুলো। পার্কের মধ্যে একটা বকুল গাছের নীচে ওরা বসলো। দু'জনের ব্যবধান প্রায় দু'হাত। মালবিকা কতকগুলো ঝরা বকুল ফুল নিয়ে নাকের কাছে ধরল —মৃদু সুবাস অনুভব করল। প্রসূন একটা সিগারেট নিয়ে দুটো ঠোঁটের আলতো চাপে ধরে রইল। প্যান্টের পকেট থেকে গ্যাস লাইটা'রটা জেলে সিগ্রেটে অগ্নি সংযোগ করল। কতকগুলো ধোঁয়ার রিং বার করল মুখ দিয়ে নিতান্ত আমেজের আবেশ। কেউ কারো পানে তাকিয়ে নেই। দু'জনের দৃষ্টি সম্পূর্ণ ভিন্ন দিকে। কারো মুখে কোন শব্দ নেই। যেন দু'জনে একে অপরের অপরিচিত। স্তব্ধতা ভেঙ্গে প্রসূন এক সময়ে বলে—আচ্ছা, আপনি ভবিষ্যতের জন্য কিছু ভাবেন ?

—হ্যাঁ, ভাবি।

—কি ভাবেন ?

—ভাবি, অভিনয়ই যখন আমার জীবিকা, তখন এই পথেই আমাকে আরো সম্মান-খ্যাতি অর্জন করতে হবে। আমি সেই রকমই স্বপ্ন দেখি— ভবিষ্যতে সুচিত্রা সেনের মত অভিনেত্রী হতে চাই।

—আচ্ছা, আপনি এরকম স্বপ্ন দেখেন না ?—যে আপনার একটা ছোট্ট সংসার……

মালবিকা যেন হঠাৎ চাবুকের আঘাত পেল। প্রসূনের পানে ঘুরে বসল, একটা ব্যর্থতা আর হতশার সুরে বলল—চাইলেই তো আর পাওয়া যায় না। ভাগ্যের কাছে অনেক অপ্রাপ্যকে মেনে নিতে হয়, স্বীকার করে নিতে হয়।

—এ আপনার ভুল ধারনা। মৃদু প্রতিবাদের সুরে প্রসূন বলল। ভাগ্য মানুষকে তৈরী করে নিতে হয়। প্রাপ্য নিজেকে আদায় করে নিতে হয়। এ জগতে কেহ কাউকে আপন ইচ্ছায় কিছু দেয় না। আমার যেটা আকাঙ্খা সেটা আমাকেই পূরন করতে হবে। অন্যের আশায় আমি বসে থাকিনা। বলতে এখন কোনও সংশয় বা লজ্জা নেই—'আমি তোমায় পেতে চাই।'

—প্রসূনবাবু ! মালবিকার কণ্ঠে মৃদু আর্তস্বর !

—বাবু নয়, মালবিকা। আই লাভ ইউ, এ্যাট ফার্ষ্ট টাইম। কিন্তু বিশ্বাস করো আমি শুধু তোমার রূপে গুণে মুগ্ধ হইনি। তোমার বেদনাকে, তোমার দুঃখকে, তোমার ব্যর্থতাকেও আমি ভালবাসি। আমার জীবনে এনে তোমাকে আমি গ্লানি মুক্ত করতে চাই। বলো মালবিকা—তুমি রাজী আছ ? অভিনয় তুমি ছেড়ে দেবে। সংসার জীবন-যাত্রা নির্বাহ করবে। অদ্ভুত এক অবাক বিস্ময়ে মালবিকা ফ্যাল ফ্যাল করে প্রসূনের পানে তাকিয়ে থাকে। প্রসূন কখন যে তার অতি নিকটে এসে ডানহাত ধরেছে, সেটা টেরও পায়নি। এমনি এক আকস্মিক প্রস্তাবে অভাবনীয় দাবীতে মালবিকা যেন দিশেহারা হয়ে গেছে। অসহায় বোবাদৃষ্টিতে প্রসূনের পানে তাকিয়ে থাকে। মালবিকার মনে সংশয় ; প্রসূন জানে না মালবিকার জন্ম পরিচয়ের ক্লেদাক্ত ইতিহাস। সমাজে মালবিকার স্থান কোথায় ? যৌবনের রঙ্গিন দৃষ্টিতে সব কিছুকে সুন্দর ভেবে প্রসূন আজ এমন এক অসাধারণ কথা বলতে দ্বিধা করেনি। কিন্তু প্রসূনের রক্তের উৎস ? প্রসূন চট্টোরাজের অহংকারী সমাজ ? এরা কি মেনে নেবে মালবিকাকে ?—মালবিকার মনের মধ্যে এই জিজ্ঞাসা গুলো ঘূর্ণাবর্তের মত ঘুরছে।

—কি ভাবছ, মালবিকা—উৎকণ্ঠার আবেগে প্রসূন প্রশ্ন করল।

ডান হাতের নাড়া পেয়ে মালবিকা সম্বিৎ ফিরে পেল। ভাব লেশহীন গলায় বলল, কিন্তু ?

—কিন্তু'র জের টেনে বিষয়টাকে জটিল করে তুল না মালবিকা, এর মধ্যে কোন 'কিন্তু' কে প্রশ্রয় দিও না।

—দিতে তো চাই না, তবু এসে যায়। সমাজেব ভয়ে অনেক 'কিন্তু' এসে গিয়ে আমাদের সব আশা-আকাঙ্খাকে ধূলিসাৎ করে দেয়। একটা 'কিন্তু'র জবাব দিতে গিয়ে মানুষের পুরো জীবনটাই ফুরিয়ে যায়। আমি জানি না; ধর্ম সমাজের ঐ ক্ষুদ্র বাধাগুলো কে কোনদিন আমি মানসিকতার ওপরে স্থান দিই না।

ঈষৎ বিষন্ন হাসি হেসে মালবিকা বলল,—কিন্তু মানুষের মনের নিভৃততম অনুভূতিটা সমাজের প্রভাবে প্রভাবিত হতে পারে না বলেই তো মনুষ্য জীবন এত বৈচিত্রময়।

—অতশত আমি চিন্তা করি না, মালবিকা। এখন আমি একটা কথা তোমার মুখে শুনতে চাই—সেটা হল, এতে রাজী আছো তো?

—আমার মনে হয় এটা আপনার খেয়াল!

—কি বললে?

—হ্যাঁ, এটা আপনার খেয়াল অথবা নেশা ছাড়া আর কিছু নয়।

—এ ধারণা তুমি করতে পারলে মালবিকা? তোমার কি সাধারণ মন বলে কিছু নেই?

—সবই আছে, তবে মনে হয় —এটা আপনার খেয়াল।

আপনার উদবিগ্ন চিত্তের বিভ্রম মাত্র। আপনার এই বিশেষ বয়সের নূতন নেশাটা আমাকে আমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে অন্ধের মত টেনে নিয়ে যাচ্ছে।

—আমি তাই চাই মালবিকা। তুমি অন্ধের মত চলে এসো আমার আলোর সাম্রাজ্যে। আমি তোমার চোখ খুলে দেব। সে আলোয় দেখবে তোমার মত সমাজের সকল উপেক্ষিত নারীর সমান অধিকার আছে। তাদের জীবন শুধু আর্তনাদের নয়। সমাজের ঠুনকো ন্যায় নীতির কাছে তারা ঘৃণিত নয়, নিন্দিতা নয়। একটা সূর্য্যের আলোয় যেমন জগতের সকল প্রাণীর সমান অধিকার আছে, তেমনি তোমাদেরও—সমান অধিকার আছে; মানুষের সমাজে যোগ্য মর্য্যাদা নিয়ে বাঁচবার।

—আপনার কথা আমি মানলাম। কিন্তু—

—না, তীব্র প্রতিবাদ করল প্রসূন। বলল,— কোন কিন্তু নয়। আমি মাত্র দু'দিন সময় দিচ্ছি, তুমি মনস্থির করে আমাকে জানাবে। চল আজ ওঠ— ঘণ্টা বেজে গেল, গেট বন্ধ হবে। মালবিকা অনিচ্ছাসত্ত্বেও উঠে পড়ল।

।। ৬ ।।

মালবিকা মনস্থির করেছিল। প্রসূনের জীবনের সাথী হয়ে চলবার জন্য মনস্থির করেছিল। এ ছাড়া মালবিকার কোন উপায় ছিল না। থিয়েটারের ম্যানেজার শুভঙ্কর বাবু মালবিকার সমস্ত সুযোগ সুবিধা করে দেবার ব্যবস্থা করেছিলেন। তবু মালবিকা শুভঙ্কর বাবুর প্রস্তাবে রাজী হয় নি, কারণ—সেখানে ছিল কামনার ছিটে ফোঁটা, ছিল লালসার লক্‌লকে জিভ, ছিল স্বার্থের ভাণ্ডার পূরণের কৌশল। তাই মালবিকা প্রসূনের ভালবাসার স্রোতে গা ভাসিয়ে দিয়েছে। এক কথায়—থিয়েটার ছেড়ে দিয়েছে। সামান্য পেটের জ্বালা মেটাতে তার মুকুলিত যৌবনকে প্রতিদিন হাজার হাজার কামনায় উন্মাদ দর্শকের লালসাসিক্ত দৃষ্টির সামনে তুলে ধরা, বেঁচে থাকার এই জঘন্য প্রয়াস মালবিকার জীবনকে অতিষ্ঠ করে তুলেছিল। তাই অনেক চিন্তা করার পরই মালবিকা প্রসূনের প্রস্তাবে রাজী হয়েছিল। ওরা একদিন (দু'জনে) ম্যারেজ রেজিষ্ট্রী করে নিল। তারপর একদিন কার্শিয়াং বেড়াতে গেল। গয়াবাড়ী ষ্টেশন পেরিয়ে পাহাড়ের উপর থেকে ঝড়ে পড়েছে পাগল ঝোরা জলপ্রপাত। —সেই জলপ্রপাত দেখে মালবিকাও পাগল হয়েছিল আনন্দে। মাটি থেকে কার্শিয়াং প্রায় পাঁচ হাজার ফুটের কিছু কম, তাই এ স্থানে শীত অপেক্ষাকৃত কম। ওরা গয়াবাড়ীর নিকট একটা ট্যুরিষ্ট লজে রইল। ওখানকার স্রোতাস্বিনী নদীর কুলুকুলু শব্দের সঙ্গে মালবিকা হেসেছে খিলখিল শব্দে। প্রসূনের স্পর্শে হাওয়া লাগা ঝাউয়ের মত শিহরিত হয়েছে, সব মিলিয়ে ওরা দু'জনে দুর্বার হয়ে উঠেছিল। নির্জন মুহূর্তগুলো ওরা কখনো শংকা কখনো বা উন্মত্ততায় কাটিয়েছে। রাত্রে চাঁদের আলো দেখবার জন্য ঘর ছেড়ে বেরিয়ে পড়েছিল। এমনিভাবে মালবিকা ভ্রুকুটি হেনে বলল,- পাগল!

প্রসূন বলল,—একটা রাতের জন্য 'পাগল' হলেই বা ক্ষতি কি?

মালবিকা আর কোন কথা বলেনি। প্রগলভ হাসির উচ্ছ্বাস তুলে চাঁদের আলোয় স্নান করতে ছুটে বেড়িয়ে গেল পাহাড়ের দিকে।

মালবিকার উচ্ছাস প্রসূনকে মাতাল করলো।

আকাশের নীচে আর পাহাড়ের ওপরে ওরা দু'জন— হঠাৎ মালবিকা প্রসূনের কাছ থেকে পালিয়ে পাহাড়ের ঢালু পথ দিয়ে ছুটে চলে— প্রসূন আনন্দে গান ধরে :

"আরে রে রে-রে
ভাগতে হুঁ/হায় ক'হা।
তেরী মেরী প্যায়র হো গয়ী, তু মুঝে ছোড়কে কভী না যা—
তুঝপে লেকর পুরী যা কর সমুন্দর মে নহানা
ঝাউ ঝাড় মে যাকর ফোটো খিঁচেগা—
তু শো যায় গা, ম্যায় তেরী বাহোমে খো যায়েগা।
ও 'প্রিয়তমা'—চললে কোথায় ?
এই তুমি শোনো না—
আমার মনেতে আজ, পুলক জেগেছে ;
তোমায় কাছে পেয়ে নাচবো নতুন করে
প্রেমেরই সাজে গো
আরে রে রে-রে, চললে কোথায় এই তুমি এসো না‥‥‥‥‥‥"

ততক্ষণে মালবিকা গানের সঙ্গে গলা মেলায়—সেই নির্জন পাহাড়ে ওরা দু'জন একাকার। হঠাৎ বৃষ্টি নামে বজ্রপতন। ওরা একটা গাছের নীচে আশ্রয় নিল। তবু সম্পূর্ণ ভিজে গেল। বজ্রপতনের শব্দে মালবিকা ভয়ে বাচ্চাছেলের মত প্রসূনের বুকের মধ্যে মুখ লুকালো। সিক্ত মালবিকার শরীরেব সমস্ত চড়াই উৎরাই প্রসূন অনুভব করল। এক জীবন্ত উপলব্ধি —আবেগে জড়িয়ে ধরল মালবিকাকে।

মালবিকার অসাড় প্রায় হাতদুটো বাধা দিতে গিয়ে পারল না। এক অসতর্ক মুহূর্তে নিজেকে হারিয়ে ফেলে। একটা তপ্ত ওষ্ঠের নিবিড় স্পর্শ। একটা শিহরণ। পাহাড়ী অঞ্চলের বৃষ্টি। কিছুক্ষণ পরেই থেমে গেল। আবার খানিকক্ষণ পর চাঁদ উঠল। সমস্ত ধরণী যেন সদ্যস্নাত হল। সমস্ত মলিনতা থেকে মুক্ত। প্রসূন মালবিকা ফিরে যাবে, পা বাড়াল—হঠাৎ মালবিকা আর্ত চীৎকার করলো, উঃ মাগো!

প্রসূন বলল,—কি হলো ?

মালবিকা বলল—পায়ে কি যেন ফুটলো।

প্রসূন চাঁদের আলোয় নীচু হয়ে দেখতে চাইল। দেখল যে—কি যেন একটা হশ্‌হশ্‌ শব্দ করে চলে গেল। প্রসূন অস্ফুট স্বরে বলল,— সাপ!

মালবিকার যন্ত্রণাক্ত শরীরটা দুমড়ে গেল। প্রসূন উপায় না দেখে মালবিকার ভিজে শাড়ীর আঁচলের কিছুটা অংশ কেটে নিয়ে মালবিকার উরুতে বেঁধে দিল। তারপর ক্ষতস্থানে মুখ লাগিয়ে মুখে 'বিষাক্ত সাপের বিষ' তুলে দিয়ে মালবিকার তীব্র যন্ত্রণার অবসান করেছিল। কিন্তু আজ?

—তার নিজের বিষ মালবিকার সমস্ত শরীরকে অবশ করে দিচ্ছে, তা থেকে প্রসূন মালবিকাকে শান্তি দিতে পারলো না। সেদিন মালবিকার জন্য প্রসূন সমস্ত পৃথিবীটাকে অন্যদিকে সরিয়ে দিতে প্রতিজ্ঞা করতে পেরেছিল। আজ সমাজের ভয়ে মালবিকা'কেই প্রসূন অন্যদিকে সরিয়ে দিল। নিজেকে বড় অপরাধী মনে করল। এক সময় প্রসূন গৃহত্যাগ করলো,—অবশ্যই বাবার দেখানো যে কোন একটা পথ বেছে নিতে প্রস্তুত ছিল। মালবিকাকে নিয়ে সে চট্টোরাজ পরিবার ছেড়ে গাছতলায় থাকতে প্রস্তুত ছিল কিন্তু মালবিকা তার আগে-ই চলে গেল। এত খুঁজেও তার সন্ধান পাওয়া গেল না।... .. ...

—

॥ ৭ ॥

স্বামী ভৈরবানন্দ শিষ্যবাড়ী এসেছিলেন।

বৈদ্যবাটী গঙ্গাতীরে তাঁর শিষ্য অনিমেষ চক্রবর্তীর বাড়ী।

ভৈরবানন্দ আজ নিয়ে দু'দিনই হল শিষ্যবাড়ী এসেছেন। দুদিনই খুব ভোরে গঙ্গাস্নান করেন। আজও এসেছেন গঙ্গাস্নানে। অদূরে এক শ্মশান থেকে শুনতে পেলেন শ্লোক বাণী:

"বাসাংশী জীর্নানি যথা বিহায়
নবানি গৃহ্লাতি নরোহ পরাণি
তথা শরীরাণী বিহায়
জীর্ণন্যানি সংযাতি নবানি দেহী।"

স্বামী ভৈরবানন্দ বুঝলেন কোন শশ্মানের চিতা নিভে এল। 'জয় মা' বলে ভৈরবানন্দ স্নান সেরে সূর্যদেবকে প্রণাম করে তীরে উঠে এলেন। এমন সময় কতকগুলো জেলে এক অচেনা অচেতন মহিলার দেহ নিয়ে স্বামী

ভৈরবানন্দের সামনে রাখলো। সে মহিলা আর কেহ নয়—সে হতভাগী মালবিকা। ভৈরবানন্দ উদবিগ্ন কণ্ঠে বললেন,—কিরে একে কোথায় পেলি? কি হয়েছে?

একজন জেলে বলল—গাঙের জলে আমরা জাল দিইছিনু। আর তখনই দেখি পাড়ে এই মেয়েটা পড়ে রয়েছে।

একজন বৃদ্ধ জেলে বলল,—দেখুন তো সাধুবাবা, মনে হয় বেঁচে আছে।

ভৈরবানন্দ মালবিকার সুপ্ত হৃদস্পন্দন বুঝতে পেরেছেন। বললেন,—হ্যাঁ, বেঁচে আছে। চল্ নিয়ে চল্। তারপর মালবিকাকে অনিমেশবাবুর বাড়ী নিয়ে যাওয়া হল। সেখান থেকে হসপিট্যালে। সমস্ত ব্যবস্থা অনিমেশবাবু এবং স্বামী ভৈরবানন্দই করলেন। মালবিকা এখন হসপিট্যালে চিকিৎসাধীন। অনিমেশবাবু হস্‌পিট্যালে যাতায়াত করেন। আর ভৈরবানন্দ তাঁর গোপালনগরের আশ্রমে ফিরে এসেছেন। আশ্রমের অধিষ্ঠাত্রী মা-কালীর নিত্যপূজারী তিনি। বৈদ্যবাটী থেকে ফিরে আসার সময় শিষ্য অনিমেশকে বলেছিলেন মালবিকাব প্রতিদিনকার সংবাদ যেন গোপালনগরে পৌঁছে দেওয়া হয়। গুরুদেবেব আদেশ অনুযায়ী অনিমেশবাবু এসেছেন গোপালনগরের আশ্রমে। আনিমেশকে দেখেই স্বামী ভৈরবানন্দ বললেন—কি সংবাদ অনিমেশ? মেয়েটি ··অনিমেশবাবু গুরুদেবের পদধূলি নিয়ে বললেন, হ্যাঁ, গুরুদেব তিনি এখন সুস্থ। হসপিট্যালের নার্সেরা আপনার কথামত খুব সেবা যত্ন করেছেন।

—আচ্ছা গুরুদেব?

—কিছু বলবে অনিমেশ?

—হ্যাঁ, মেয়েটির বামহাতের পানে তাকিয়ে দেখেছেন?

—দেখেছি, বামহাতের মনিবন্ধে সাদা শাঁখাতে লালসূতা দূর্বা বাঁধা আছে। সদ্য বিবাহের চিহ্ন!

—আমার মনে হয় পণে'র ব্যাপারে বিবাহ সম্পূর্ণ হয় নি?

—তোমার অনুমানের যথার্থতা আছে। তবে আসল কারণ ওটি নয। বিবাহ অসম্পূর্ণের আসল কারণ হল বিবাহের পূর্বে-ই মেয়েটির দেহে মাতৃত্ব দেখা দিয়েছিল।

—গুরুদেব! অনিমেশবাবু চমকে উঠলেন। অবশ্য হসপিট্যালের নার্স

বলেছিলেন মালবিকার মাতৃত্বের কথা। অনিমেশবাবু শুনেছেন সে কথা। তবু গুরুদেবের কথায় যেন একটু বেশী রকম অবাক হলেন।

স্বামী ভৈরবানন্দ শিষ্যকে আদেশ দিলেন, আমার পূজোর আয়োজন কর। আমি মেয়েটির দ্রুত আরোগ্য কামনা করে স্বস্তি পূজা করব ;— আপনার আদেশ শিরোধার্য্য।

॥ ৮ ॥

যথাসময়ে স্বামী ভৈরবানন্দের আশ্রমে মালবিকা একটি পুত্র সন্তানের জন্ম দিল। ছোট্ট ফুলের মত 'দেবশিশু', দেখলে চোখ ফেরানো যায় না। আশ্রমের অন্যান্য ভক্তরাও শিশুর মুখপানে তাকিয়ে থাকে মুগ্ধ হয়ে, পলক হারা হয়ে। স্বামী ভৈরবানন্দ তাকে 'দাদুভাই' বলতে অজ্ঞান। কিন্তু মালবিকা শিশুর পানে বেশিক্ষণ তাকিয়ে থাকতে পারে না। যেন একটা চির পরিচিত চেনামুখ ঐ শিশুর মুখের মধ্যে দেখতে পায়। তাকিয়ে থাকতে থাকতে কখন যে দু' চোখে জল এসে ভরে গেছে, মালবিকা টেরও পায় নি। কখন যে স্বামী ভৈরবানন্দ মালবিকার সামনে এসে দাঁড়িয়েছে সে টের পায় নি। ভৈরবানন্দ মালবিকার মাথার ওপরে তাঁর ডান হাতখানি স্থাপন করলেন। একটা গাঢ় শীতল সান্ত্বনার স্পর্শ অনুভব করল মালবিকা। মাথা তুলে দেখল ভৈরবানন্দ তার সামনে। মালবিকা নিজের উদ্গত কান্নাকে চাপতে ঠোঁট কামড়ে ধরল। আপ্রাণ চেষ্টা করেও কান্না চাপতে পারল না। কান্নায় ভেঙ্গে পরল। স্বামীজি একটু বিচলিত হলেন। বললেন—না মা, সন্তান কোলে আছে। এ অবস্থায় কান্না কল্যাণকর নয়। দাও দাদুভাইকে আমার কোলে দাও। একরকম জোর করেই সন্তানকে স্বামীজি নিজের কোলে নিয়ে বললেন,—যাও সন্ধ্যা হয়ে এল। আমার পূজার ব্যবস্থা কর।

মালবিকা মন্দিরের মধ্যে চলে গেল। সন্ধ্যা হয়ে আসছে। মন্দিরের ভিতর একটা প্রদীপ জ্বলছে। শুক্লপক্ষের একফালি চাঁদের আলো আশ্রমের গাছের পাতার ফাঁক দিয়ে পড়েছে। অল্প আলো আঁধারিতে সমস্ত আশ্রমটা মায়াময় পরিবেশ সৃষ্টি করেছে। অনেক ভক্ত মন্দিরের দালানে হাজির হয়েছে। গোপালনগর ও তার পার্শ্ববর্ত্তী অনেক গ্রামের মানুষের মনে আস্থা (বিশ্বাস) আছে ঐ মন্দিরের অধিষ্ঠাত্রী দেবী'র উপর তথা স্বামী ভৈরবানন্দর উপর. তাই অনেকেই যে যার মানত করে বসে থাকে।

মালবিকা মন্দিরের ভিতর পূজার আয়োজন করছে।

স্বামী ভৈরবানন্দ কুটির দালানে বসে তাঁর তেজদীপ্ত চোখেতে দেখতে পেলেন একটা ছায়ামূর্ত্তি ক্রমশঃ তাঁর দিকে এগিয়ে আসছে। স্বামীজি গম্ভীর গলায় বললেন,—কে?

—আমি অনিমেশ গুরুদেব! স্বামীজিকে প্রণাম করে বলেন,—কেমন আছেন গুরুদেব?

—মায়ের কৃপায় ভালই আছি। এই বুঝি মালবিকার সন্তান?

—হ্যাঁ, আমি ওর নাম রেখেছি 'রাজেশ'। রাজ বলেই ডাকবো?

—মালবিকা কোথায়?

—আমার পূজার ব্যবস্থা করতে মন্দিরের ভিতরে গেছে। এখুনি আসবে, তুমি বস।

—অনিমেশবাবু ভৈরবানন্দের পাশে বসলেন। বললেন, গুরুদেব একটা কথা বলবো বলেই এসেছিলাম।

—ভৈরবানন্দ নিরাসক্ত কণ্ঠে বললেন,—কি কথা বলো?

—মালবিকার স্বামী ওকে খুঁজছেন!

—এ্যা চমকে ওঠেন ভৈরবানন্দ, বললেন ওর স্বামী কোথায়?

—ঠিকানা তো দেননি, সংবাদ পত্রে মালবিকার ছবিসহ বক্স নাম্বার দিয়েছেন। লিখেছেন 'সন্ধান পাইলে' এই নাম্বারে পত্র লিখুন। সন্ধানদাতাকে উপযুক্ত পুরস্কৃত করা হইবে। বলতে বলতে একটি কাগজের অংশ বিশেষ ভৈরবানন্দের চোখের সামনে তুলে ধরলেন।

স্বামীজি মালবিকার ছবিটা দেখলেন।

অনিমেশবাবু আবার বললেন—এখন আপনি যদি অনুমতি দেন, তবে আমি পত্র লিখতে পারি। কিছুক্ষণ চিন্তা করার পর ভৈরবানন্দ বললেন—এতে আমার অনুমতি নিষ্প্রয়োজন, তুমি মালবিকাকে জিজ্ঞাসা কর। ঐ তো মালবিকা আসছে।

—বাবা, আপনার পূজার আয়োজন সম্পূর্ণ। হঠাৎ অনিমেশবাবুকে দেখে মালবিকা বলল—একি আপনি! কেমন আছেন?

—ভাল—আপনি?

ভালো আছি বলে স্বামীজির কোল থেকে শিশুকে নিজের কোলে নিয়ে বলল—চলুন ঘরের ভেতর বসবেন।

—আমি এসেছিলাম, আপনার কাছে একটা অনুমতির জন্য।

গুরুদেব যেখানে আছেন সেখানে আমার অনুমতি নিষ্প্রয়োজন। ভৈরবানন্দ বললেন,—না মা। এখানে তোমার অনুমতিটাই বেশী প্রয়োজন আর অনুমতি দেওয়াই উচিত।

—বিষয়টা সম্বন্ধে/সম্পর্কে আমি এখনও সম্পূর্ণ অবগত নই গুরুদেব।

অনিমেশবাবু বললেন,—আপনার স্বামী আপনাকে খুঁজছেন।

কথাটা শুনে মালবিকার মাথাটা যেন মুহূর্তে ঘুরে গেল। চোখে অন্ধকার দেখলো। তারপর নিজেকে সংযত করে বলল,—না।

গুরুদেব বললেন—না, কেন? তোমার স্বামী যখন খোঁজ করছেন?

—যে আমায় ত্যাগ করেছে তার কাছে আমি যাই কি করে?

—কিন্তু তোমার মুখে বিবরণ শুনে আমার মনে হচ্ছে, তোমার স্বামী তোমাকে ত্যাগ করেনি। তোমার শ্বশুর মহাশয় তাঁর বংশের গৌরব অক্ষুন্ন রাখতে তোমাকে পুত্রবধূ হিসাবে গ্রহণ করতে পারেননি। তাই আমি বলছি তোমার স্বামী যখন ·······গুরুদেবের কথার মধ্যেই মালবিকা বলল, কিন্তু গুরুদেব, যেখানে আমার মাতৃত্বের চরম অপমান ঘটেছে সেখানে কি আমি শান্তি পাব? তাছাড়া তিনি আমার খোঁজ করছেন। এটা কি সম্পূর্ণ বিশ্বাসযোগ্য?

—অবিশ্বাসের-ই বা কারণ কি?

—কারণ, যেদিন আমার শ্বশুর মহাশয় আমার এই সন্তানকে অবৈধ বলে মনে করে আমাকে তাড়িয়ে দিলেন, সেদিন তিনি কেন কোন প্রতিবাদ করেননি? কেন-ও মেনে নিতে পারেননি আমার মাতৃত্বকে?

—হয়তো আজ তাঁর সেই ভুল ভেঙ্গেছে। সেই ভুলের মাশুল দেবার জন্যই তোমার সন্ধান করছেন।

কিন্তু গুরুদেব, আমি যে আপনার কাছে থেকে একটা অন্য জগতের সন্ধান পেয়েছি। মায়া মমতা, সুখ-দুঃখ, মান সন্মান, কামনা বাসনা, কলঙ্ক, অপমান সব কিছুরই স্বাদ আমি পেয়েছি। এখন আপনার দেখানো নূতন পথে নূতন জগতেই থাকতে আমার ইচ্ছা। পার্থিব জগতে আমি অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছি।

—তোমার কথা সব বুঝলাম। তবু সব কিছুর পরেও একটা অহংবোধ তোমার মধ্যে প্রকাশ পাচ্ছে। যেটা নারী জীবনে থাকা উচিৎ নয়।

—এমন ভয়ানক সন্দেহ করবেন না গুরুদেব। আপনার এই আশ্রমে থেকে আমি আমার সমস্ত কিছু ঐ মায়ের চরণে বিসর্জন দিয়েছি। এখন এই ছেলেটাকে মানুষ করতে পারলেই আমি সম্পূর্ণভাবে নিজেকে মায়ের নিকট সঁপে দিতে পারবো। মালবিকার কথা শুনে ভৈরবানন্দ বুঝলেন—মালবিকা তার সংসার জীবনে আর ফিরে যেতে চায় না। কিছুক্ষন পরে তিনি বললেন,—যাক্ তুমি যা ভাল বোঝ করো। হ্যাঁ, অনিমেশ—তুমি বোস আমি পূজো সেরে আসছি। ভৈরবানন্দ মন্দিরে প্রবেশ করলেন।

কিছুক্ষণ পর অনিমেশবাবু বললেন,—আমার মনে হয় এতে আপনি অনুমতি দিলেই ভাল করতেন।

—না, অনিমেশবাবু। আমি স্থির সিদ্ধান্তে আছি। একে মানুষ করতে পারলেই আমি আমার বাকী জীবন এই মন্দিরে মায়ের সেবায় লাগাবো। বলতে বলতে মালবিকা অশ্রুসিক্ত চোখে শিশুর মুখে চুম্বন করল।

—এরপর আর আপনাকে কিছু বলার নেই। ভেবেছিলাম—

অনিমেশবাবুর কথার মধ্যেই মালবিকা বলল,—তার জন্য আমি দুঃখিত। আপনি আমার জন্য অনেক করেছেন। তাই আপনার এ প্রস্তাব আমার মেনে নেওয়া উচিৎ ছিল, কিন্তু—মালবিকা আর বলতে পারলনা—বোবা কান্না এসে তার কণ্ঠকে রোধ করল।

॥ ৯ ॥

শেষে প্রসূন জব্বলপুরে নেমে রান্‌ঝি বাজারে একটা ঘর ভাড়া নিয়ে থাকে। কোন পরিচিতি জন কেউ নেই। সারাদিন ঘরের মধ্যেই কাটায়। কখনো বা বাড়ীওয়ালার সাথে দু-এক কথা হয়। তাও হিন্দীতেই বলতে হয়।

বাড়ীওয়ালা অবাঙ্গালী, বাংলা ঠিক বলতে পারেন না। তাই প্রসূন যেন ঠিক মনের মতো সাথী পায় না। তাই প্রতিদিন বিকালে একটু বেড়াতে বের হয়। বিকাল তখন চারটে হবে-রৌদ্রের তাপ কমতে শুরু করেছে। বেড়াতে বেরিয়ে প্রসূন নিজেরই অজান্তে কখন যে রান্‌ঝি এলাকা পেরিয়ে খামারিয়া ফ্যাক্টরীর কাছে এসে পড়েছে সে জানে না। টেসটিং—এর জন্য ফ্যাক্টরীর শব্দে প্রসূন সম্বিত ফিরে পেল। এতক্ষণ নিশিতে পাওয়া ঘোরের মত হেঁটে হেঁটে সে কতদুর এসেছে বুঝতে পারলো। দিনের আলোর পর চারিদিকে অন্ধকার নেমেছে—সেটাও এতক্ষণে বুঝতে পারলো। অন্ধকার

হয়েছে। রাস্তার দু'পাশে সারি সারি আলোগুলো জলে উঠেছে। মাঝে মধ্যে দু'একটা মালবাহী ট্রাক আর মোটর তার তীব্র আলোয় প্রসূনের চোখ ধাঁধিয়ে দিয়ে চলে যাচ্ছে। প্রসূন এবার বাড়ী ফিরছে। আজ একটু বেশী দেরী হয়ে গেল। মনের মধ্যে একটা যন্ত্রণা নূতন করে শুরু হয়েছে। সারাদিন ঘুরে বেড়িয়ে প্রসূন মালবিকার কথা মন থেকে যেন একটু দূরে সরিয়ে রাখতে পারে। কিন্তু সূর্য্যের আলো চলে গেলেই যে অন্ধকার নেমে আসে, সেই অন্ধকারের গহ্বরে প্রসূন নিক্ষিপ্ত হয়। যেখানে আছে শুধু ব্যর্থতার জ্বালা, পরাজয়ের গ্লানি, আছে নিদারুন শূন্যতা—প্রানান্তকর নির্জ্জনতা। মনে পড়ে যায় মালবিকার সেই সকরুন মুখখানি। মনে পড়ে সেই বর্ষন মুখর রাত্রের মূঢ়তার কথা। মনে পড়ে মালবিকার মাতৃত্বের অবমাননার কথা। নিশীথতন্দ্রার মধ্যে প্রসূন যন্ত্রনায় ছট্‌ফট্ করে। কোন দিন রাত্রে আর্ত চীৎকার করে ওঠে। নিজেরই অজান্তে 'মালবিকা' বলে হঠাৎ-ই ডেকে ওঠে। সেই রাত্রি আসছে। মালবিকাকে নিয়ে বেশী করে চিন্তা করবার মুহূর্তগুলো এগিয়ে আসছে। অতীত স্মৃতিগুলো তার বিষাক্ত ফণাতুলে ছোবল মারবে এইবার। প্রসূন সারারাত ঘুমোতে পারবে না। স্মৃতির বোলতাগুলো এবার ঝাঁকে ঝাঁকে এসে প্রসূনকে হুল ফোটাবে। প্রসূনের সমস্ত শরীর ও মনকে জর্জরিত করবে। তাই অন্ধকারের ঘনঘটা নামলেই শুরু হয় প্রসূনের মর্মবেদনা।

আমরা বলি—'সময়ে সব সযে যায়', কিন্তু মানুষ বিশেষ করে প্রেমময় জীবনের ব্যর্থতাকে কোনদিন মন থেকে একেবারে মুছে ফেলতে পারে না। প্রতি মুহূর্তে মনের মধ্যে সে বেদনা ফল্গু ধারার মত নীরবে বহে যায় অহরহ। অন্যে তা টের পায় না। হয়তো কিছুদিনের জন্য সে দুঃখকে, সে বেদনাকে একটা কৃত্রিম আনন্দ দিয়ে দূরে সরানো যায়। কুচি পানার পুকুরে ঢিল ফেলার মত। দুঃখগুলো সেই কুচি পানায় আবার মানুষের মনে জায়গা করে নেয়। প্রসূনের ঠিক তেমনি অবস্থা, তার মনের মধ্যে ব্যর্থতার মসিময় প্রদীপটা জ্বলে উঠলো। তার সমস্ত বহিরঙ্গ হবে মসিলিপ্ত, অন্তরঙ্গ পুড়ে ছাই হবার সময় আসছে। এখন থেকেই প্রসূন যেন যন্ত্রনায় কাতরাতে শুরু করেছে। সমস্ত দেহভার নেমে আসছে। ঠিকমত পথ চলতে পারছে না। টলমল করছে শরীর। অথচ এখনো অনেক পথ বাকী আছে। প্রসূন আর হাঁটতে পারছে না। দাঁড়িয়ে পড়ল রাস্তার ধারে। রাস্তায় একটা গাড়ীর

হেড লাইটের সুতীব্র আলো। প্রসূন হাত তুলে গাড়ী থামাবার চেষ্টা করল, কিন্তু ট্রাকটা সব কিছুকে অগ্রাহ্য করে চলে গেল। প্রসূন আবার ধীরে ধীরে হাঁটতে শুরু করলো ক্লান্ত পা দুটোকে কোনরকমে টানতে টানতে এগিয়ে চলে। হঠাৎ হোঁচট খেয়ে প্রসূন রাস্তার প্রায় মাঝখানে এসে পরেছিল, সঙ্গে সঙ্গে একটা গাড়ী হঠাৎ তার পিছনে এসে থামল। গাড়ীর চালক বিরক্তভাব প্রকাশ করে বলল— আরে মশাই, দেখে রাস্তা চলতে পারেন না?

প্রসূন ততক্ষণে নিজেকে সামলে নিয়েছে। চালকের মুখে খাঁটি বাংলা শুনে প্রসূন একটু আশ্বস্ত হল, কারণ এ মুলুকে বাঙ্গালী খুব কমই আছে। প্রসূন ড্রাইভারের সামনে এল। ড্রাইভারকে দেখল— সুঠাম স্বাস্থ্যের এক যুবক গাড়ীর ষ্টীয়ারিং হুইলের, ওপরে দুটো হাত রেখে বসে আছে। পরিধানে দামী মভ্‌কালারের গরম স্যুট, মুখে জলন্ত ধূমায়মান ক্যাভেণ্ডার সিগারেট। মাথায় ফেল্টের টুপি। ক্লাচ ও ব্রেকের ওপর স্থাপিত দুটি পায়ে রবার সোলের গামবুট। যুবকের ডানদিকে চোখ পড়তেই প্রসূনের বুকের ভিতরটা ধক্ করে উঠলো। মনে হল কে যেন প্রসূনকে পিছন থেকে আচম্‌কা ঠেলে দিল। যুবকের ডানপাশের শীটে হেলান আছে একটা দোনালা বন্দুক। কোনরকমে বুকে সাহস সঞ্চয় করে প্রসূন বলল— কিছু মনে করবেন না। হঠাৎ একটু থেমে প্রসূন আবার বলল—আপনার কথা শুনে মনে হচ্ছে আপনি বাঙ্গালী—আমিও বাঙ্গালী, যদি দয়া করে আমাকে রান্‌ঝি বাজারে পৌছে দেন তবে খুব উপকার হয়।

যুবকটি কিন্তু এতক্ষণে প্রসূনের মুখ পানে তাকিয়েছিল চোখের ভুরু কুঁচকে কি যেন চিন্তা করছিল। যেন একটা বহু পুরোনো হারিয়ে যাওয়া মুখের সঙ্গে মিল খুঁজে পাচ্ছিল। তা'পর প্রসূনের কণ্ঠস্বর শুনে বলে ওঠে,— আরে! প্রসূন না?

অপরিচিত যুবকের মুখে নিজের নাম শুনে প্রসূন শুধু অবাক নয়, ভীষণ বিস্মিত হল। আরো কাছে গিয়ে যুবকটিকে ভালো করে দেখলো, কিন্তু ঠিক চিনতে পারল না।

আরে, আমি সমীর! আমাকে চিনতে পারছিস্ না? কলকাতার সিটি কলেজে একসঙ্গে পড়তাম, সেই সমীর সেন।

এতক্ষনে প্রসূন পুরোপুরি চিনতে পারলো, সামান্য হেসে বলল— তুই সমীর! —হ্যাঁ আমি। আয় উঠে আয় গাড়ীতে, সমীর দরজা খুলে দিল।

প্রসূন উঠে বসল সমীরের পাশে। সমীর গীয়ার পরিবর্ত্তন করে এ্যাকসেলেটারে চাপ দিল, গাড়ী চলতে শুরু করল। সামনের দিকে দৃষ্টি রেখে সমীর বলল, তারপর প্রসূন। এখানে কোথায়? রান্‌ঝি বাজারে একটা বাড়ীতে ভাড়া থাকি।

তা হঠাৎ এই জব্বলপুরেই বা কেন?

প্রসূন একটু বিপদে পড়ল, ঠিক প্রশ্নটার কি জবাব দেবে ভেবে পায় না। বললো,—মানে এই বেড়াতে আর কি। যেন এই কথা বলে প্রসূন উদ্ধার হল। প্রসূনের উত্তর শুনে সমীর হাসল, বলল, বলিস কিরে এই জব্বলপুরে বেড়াতে? কি দেখবার আছে এখানে?

প্রসূন মর্মান্তিক চেষ্টায় মনের অবস্থাটাকে পাল্টে নিল, তারপর বলল—কেন? ছোট ছোট পাহাড় আছে, মার্বেল রক, অমর কণ্টক, নর্মদা ফলস্ আছে। আর এখান থেকে কিছুদূরে শুনেছি কি একটা জঙ্গল আছে, কি যেন নাম? প্রসূন চিন্তা করতে লাগলো। সমীর তখুনি বলল—'কিস্‌লি কান্‌হা' বুঝলি প্রসূন, ভাবছি ঐ জঙ্গলে যাব একদিন। শুনেছি অনেক কিছু পাওয়া যায়। প্রসূন বলল,—অনেক কিছু বলতে?

অনেক কিছু বলতে শিকার করার মত কিছু, যেমন ধর—বাইসন্ পাওয়া যায়। বাঘ, চিতল, লেপার্ড, হায়না। জানিস্ প্রসূন ওখানে ঝুঁটিওয়ালা ঈগল' পাওয়া যায়। সমীর একের পর এক পশুর নাম করে, আর নিজেই উৎফুল্ল হতে থাকে। পশুপাখী শিকারের ঝোঁক সমীরের ছোটবেলা থেকেই, কলকাতা থেকে সমীর প্রায়-ই চন্দননগরে প্রসূনদের বাড়ীতে চলে আসতো। ওখান থেকে দূরে হুগলীর গ্রামে গিয়ে পাখি শিকার করেছে। ধনীর ছেলে সমীর। পয়সার জন্য চিন্তা ছিল না। প্রসূনের অবস্থাও তাই। তবে শিকারের ঝোঁক সমীরের মত, প্রসূনের তত ছিল না। তবু বন্ধুর পাল্লায় পড়ে মাঝে মধ্যে বন্দুক ধরে দু,একটা বুনোপাখি মেরেছে। কিন্তু লক্ষ্যভেদে সমীর একেবারে অর্জ্জুনসম। কোন গুলিই ব্যর্থ হয় না। সেই সমীর, একদিন সরকারী চাকরী পেয়ে জব্বলপুরে চলে এল। অফিস থেকে পাওয়া ছোট্ট 'নিশান' গাড়ীটা নিয়ে আর পুরোনো সঙ্গী সেই দোনলা বন্দুকটা নিয়ে আজ দূরের জঙ্গলে শিকার করতে গিয়েছিল। ফেরবার পথে প্রসূনের সাথে হঠাৎ এইভাবে দেখা। সমীর 'একের পর এক' পশুপাখীর নাম বলে চলেছে।

হঠাৎ চোখগুলো খুশিতে উজ্জ্বল ও বড় বড় করে বলল,—জানিস্ প্রসূন ওখানকার জলা হরিণ দেখবার মতো।

তোর সেই শিকার করায় ঝোঁক দেখছি এখনো গেল না।

সমীর যেন একটু জেদী হয়ে বলল, আমি তো বলেছি যতদিন শরীরের রক্ত গরম থাকবে ততদিন থাকবো শিকারী, তারপর যখন রক্ত ঠাণ্ডা হয়ে আসবে তখনই ঐ রকম শিকার হয়ে হঠাৎ (H) মাগের (M) ভোগে (V) চলে যাব।

বলতে বলতে সমীর পিছনের সীটের পাদানির দিকে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দিল, প্রসূন দেখল, একটা বুনো হরিণ রক্তাক্ত অবস্থায় পড়ে আছে। যেন ঘুমাচ্ছে। প্রসূনের মুখটা সহসা ম্লান হয়ে হয়ে এল। গাড়ীটা ততক্ষণে রান্‌ঝি বাজারে এসে গেছে। প্রসূন গাড়ী থামাতে বলল। সমীর বলল—কেন? আমার ওখানে চ।

—না, আজ নয় পরে যাব।

—আরে তুই তো একা থাকবি তার চেয়ে আমার ওখানে চল নন্দিতা আছে। গল্প করার লোক পাবি।

—নন্দিতা, তুই তা'হলে

—বিয়ে করেছি; সমীর নির্বিকার ভাবে বলল।

—তা তো বুঝলাম। কিন্তু নন্দিতা বলতে সেই ফার্ষ্ট ইয়ারে কলেজে পড়ত যে মেয়েটি?

—হ্যাঁ, হ্যাঁ, সেই নন্দিতা, লাভ্ ম্যারেজ।

প্রসূন মৃদু হাসল। অনেকদিন পর প্রসূন হাসল। তবে এ হাসির মধ্যে কোন উচ্ছ্বাস নেই। কোন প্রাণ নেই। প্রসূন ভাবল তার পরাজয় হয়েছে। আর সমীর কেমন গৌরবের সঙ্গে কথাটা বলল—লাভ্ ম্যারেজ! হ্যাঁ, প্রসূন যাবে সমীরের বাড়ীতে। প্রসূনের এখন আনন্দ পাবার উপকরণের বেশ প্রয়োজন। সর্বক্ষণের জন্য একটা সঙ্গী চাই নইলে প্রসূন হয়তো দুদিনে পাগল হয়ে যাবে। নিঃসঙ্গতা প্রসূনকে গলা টিপে মারবে। প্রায় পনের-কুড়ি মিনিট চলার পর গাড়ীটা একটা বাংলোর সামনে এসে থামলো। সমীর বলল এসে গেছি, নেমে পড়।

গাড়ীর শব্দ শুনে চাকর জগলাল ছুটে এল। সমীর বলল, গাড়ীর মধ্যে শিকার আছে। টমি'কে দিবি।

—ঠিক হ্যায় সাহাব।

সমীর আগে আগে চলেছে বন্দুকটা নিয়ে। প্রসূন তার পিছনে। পর পর কতকগুলো সিঁড়ির ধাপ বেয়ে (অতিক্রম করে) উঠে একটা চাতাল। প্রসূন সেখানে দাঁড়িয়ে পিছন দিকে ফিরে তাকাল। চারিদিকে আলো ঝলমল্ করছে। তারই মাঝখানে এই বাংলো বাড়ী। চাতাল পার হয়ে গিয়ে একটা গেট। ওরা সেটা পার হল, সামনে পড়লো লম্বা করিডর। বাড়ীটাকে বাইরে থেকে দেখে মনে হয় বাংলো কিন্তু ভিতর থেকে মনে হয় একটা সুদৃশ্য ক্যাসল্. শ্বেত পাথরের মোজাইকে মোড়া মেঝ। ছাদ থেকে ঝুলছে কতকগুলো ঝাড়লণ্ঠন। সে আলোয় দেখা গেল করিডরের দক্ষিণ দিকে একটি সিঁড়ি উপরে উঠে গেছে। সমীর প্রসূনকে সেদিকে যাবার জন্য আহ্বাণ করল। সিঁড়ির কাছে যেতেই ভয় পেয়ে থমকে দাঁড়ালো। সমীর বলল,—আঃ টমি! চীৎকার করে না।

প্রসূন দেখল একটা প্রচণ্ড রাগী লোমশ পিকিনিজ কুকুর লোহার চেনের সঙ্গে বাধা আছে। মনিবকে দেখে আনন্দে লেজ নাড়ছে। ও'রা দু'জনে সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠে গেল। দোতালায় লম্বা করিডর, করিডরের ধারে ধারে পিতলের স্ট্যাণ্ডের ওপর সিলভারের টব। জয়পুরী নক্সা আঁকা। টবে নানারকম পাতাবাহার সিজিন ফ্লাওয়ার। প্রত্যেক ঘরেই আলো জ্বলছে। ওরা দু'জনে পর পর চারখানাঘর পেরিয়ে গেল। নন্দিতা,—দেখো কাকে এনেছি? বলতে বলতে সমীর একটা ঘরের পর্দা সরিয়ে ঘরে প্রবেশ করে। ভিতর থেকে একটা মেয়েলি কণ্ঠস্বর, কে ?

প্রসূন ধীর পদক্ষেপে ঘরের মধ্যে প্রবেশ করল। কতকগুলো ঝাড়লণ্ঠন এর আলোয় ঘরটা উজ্জ্বল হয়ে আছে। বড় হলঘরের মতো। একপাশে একটা মেহগনী কাঠের পালঙ্ক। তার ওপরে ধবধবে পরিষ্কার শয্যা। ইতালিয়ান শ্বেত পাথরে মোড়া মসৃন মেঝ। নানা আসবাবপত্র, দ্রব্য সামগ্রীতে ঘরটা প্রায় ভর্ত্তি। এক পাশে স্টীল শেফ্। তারই পাশে প্রমাণ সাইজ আয়না লাগানো কাঠের আলমারি-আয়নার সামনে একটা টুলের ওপর বসে নন্দিতা কেশবিন্যাস করিছিল, প্রসূনকে দেখে সে চিনতে পেরে বলল আরে প্রসূন দা—

নন্দিতা প্রসূনকে দেখেছে কলকাতার সিটি কলেজে। প্রসূন আর সমীর যখন থার্ডইয়ারে, নন্দিতা তখন সবে এ্যাড্মিশন্ নিয়েছে। তারপর এক কলেজ ফাংশন সূত্রে ওদের পরিচয়।

নন্দিতা যদিও সুন্দরী নয়—তবু মোটামুটি সুশ্রী বলা চলে। ভোরের আকাশের মতই উজ্জ্বল গায়ের রং। পূর্বের থেকে স্বাস্থ্য ভাল হয়েছে। একটু বেশী রকম ফ্যাশনেবল্ হয়েছে। এটা তার প্রসাধণ সামগ্রী দেখলে বোঝা যায়। ছোট টেবিলের ওপর নানা ধরণের ছোট বড় শিশি। সেন্টের শিশি, নানা প্রকার ক্রিম, পাউডার, স্পিরিট, গাম, পরচুলা খোঁপা, একটা ছোট্ট কাঁচি-ও রয়েছে। প্রসূন নন্দিতার পরিবর্তন লক্ষ্য করছিল।

—কি রে, চিনতে পারছিস্ না? সমীর বলল এই হচ্ছে মাইডিয়ার বৌ।

সমীরের কথা শুনে প্রসূন ও নন্দিতা হেসে উঠলো। সমীরও সেই হাসিতে যোগ দেয়।

॥ ১০ ॥

বসুরাজ॥ শুক্তিমতি, তোমাকে দেখে মনে হচ্ছে, তুমি নির্ভয়া নও। মনে হয় তুমি ভীতা শংকিতা।

শুক্তিমতি॥ হ্যাঁ পিতা, আমি ভীতা-শংকিতা।

বসুরাজ॥ কিন্তু কেন? আমি তো তোমাকে ঐ কামান্ধ কোলাহলের হাত থেকে উদ্ধার করেছি।

শুক্তিমতি॥ তা করেছেন, কিন্তু সেই ধর্ষকের বিষ আমার যৌবনোর্বর শোনিতে মিশে গিয়ে এক নূতন প্রাণের সৃষ্টি হয়েছে, সেই প্রাণের কথা ভেবে আমি ভীতা, শংকিতা।[২] আমার কুমারীত্বের মধ্যেই যে আমার সন্তানের জন্ম।

বসুরাজ॥ কি বলছ-নারী!

শুক্তিমতি॥ বলুন পিতা আপনার রাজ্যের অন্যান্য সকল মানুষের মতই আমার সন্তান ও সমান মর্য্যাদা পাবে?

বসুরাজ॥ না—

শুক্তিমতি॥ পিতা!

বসুরাজ॥ আমার স্থির বিশ্বাস, শ্বাপদের ঔরসজাত সন্তান শ্বাপদই হবে। আর সেই শ্বাপদপ্রায় মানুষের স্থান আমার রাজ্যে নেই।

শুক্তিমতি॥ কিন্তু পিতা, মানুষের প্রণয় জাত সন্তানও তো শ্বাপদ হতে পারে?

বসুরাজ ॥ কুর্তক ক'রো না নারী। এখন বুঝেছি, তোমার সেই কাতর আহ্বানে সাড়া দিয়ে আমি ভুল করেছি। তোমার সেই আর্তনাদ ছল মাত্র!

শুক্তিমতি ॥ না পিতা, সে আর্তনাদ ছল নয়। আমি সেই কামার্ত কোলাহলের আক্রমণ থেকে মুক্তি পাবার জন্যই আর্তনাদ করেছিলাম।

বসুরাজ ॥ তবে কেন, তুমি তোমার সেই কামান্ধ সৃষ্টিকে ঘৃণা করতে পারছ না?

শুক্তিমতি ॥ কি করে পারি পিতা, হাজার হলেও সে আমারই সন্তান।

বসুরাজ ॥ কিন্তু আমি তাকে কোন মানব স্বীকৃতিতে আমার রাজ্যে স্থান দেবো না—

শুক্তিমতি ॥ কেন পিতা? আপনার রাজ্য কি কথনো নারীর ক্ষেত্রজ সন্তান নেই?

বসুরাজ ॥ আছে।

শুক্তিমতি ॥ আপনার রাজ্যে কি কোন কুমারী নারীর সন্তান নেই?

বসুরাজ ॥ আছে

শুক্তিমতি ॥ আপনার রাজ্যে কি কোন বহুবল্লভা নারী নেই?

বসুরাজ ॥ আছে।

শক্তিমতি ॥ আপনার রাজ্যে কি প্রোষিত ভর্তৃকা নারীর ক্রোড়ে সন্তান আবির্ভূত হয় নি?

বসুরাজ ॥ হয়েছে।

শুক্তিমতি ॥ আপনার রাজ্যে কি কোন বৈপিত্র নেই?

বসুরাজ ॥ হ্যাঁ, আছে।

শুক্তিমতি ॥ আপনার রাজ্যে কি কোন বিবাহিতা নারী পর পুরুষের সঙ্গে প্রজায়িনী হয়ে ক্ষেত্রজ সন্তান ক্রোড়ে ধারন করেনি?

বসুরাজ ॥ করেছে।

শুক্তিমতি ॥ সেই সব সন্তান, আপনার বিচারে কি মানুষ?

বসুরাজ ॥ হ্যাঁ মানুষ।

শুক্তিমতি ॥ তবে কেন, আমার সন্তান আপনার বিচারে মানুষ বলে বিবেচিত হবে না?

বসুরাজ ।। কারণ, তোমার সন্তান একটা জঘন্য কুসংস্কারের মধ্যে জন্ম নিয়েছে। তোমার সন্তান একটা বীভৎসতা নিয়ে জন্মাবে। যা দেখে তুমি মা হয়েও সে সন্তান কে ভয় পাবে।

শুক্তিমতি ।। না! পিতা এ আপনার ভুল ধারণা।

বসুরাজ ।। আ! মূঢ় নারী! তুমি কি জাননা এই পৃথিবীতে সমস্ত বলাৎকৃতা নারীর দেহজাত সন্তান, এ সংসারে অন্তজাধম! একটা পাপ!

শুক্তিমতি ।। এমন অশুভ ভয়ঙ্কর সন্দেহ করবেন না পিতা।

বসুরাজ ।। আমি বিস্মিত হচ্ছি-তোমার ঐ আগত প্রায় অন্ত্যজাধমের প্রতি এত মোহ কেন? কেন তুমি ঐ সন্তান কে অস্বীকার করছ না?

শুক্তিমতি ।। পিতা, আমার দেহের রক্তের সৃষ্টি। আমার স্নেহ মমতার সৃষ্টিকে আমি যে দশমাস গর্ভে রেখে লালন-পালন করব তাকে আমি কেমন করে ঘৃনা করব? বলুন কেমন করে তাকে অস্বীকার করবো? নানা আমি পারব না—পারব না [কান্না]

বসুরাজ ।। একটা অপজাত সন্তানকে যদি তুমি ঘৃনা করতে না পার, তবে সে শাস্তি তোমাকেই ভোগ করতে হবে। নারী, এই হল আমার বিচার।

[সদর্পে ক্রোধে প্রস্থান]

শুক্তিমতি ।। পিতা, শুনে যান পিতা, আমার আরো কিছুর বলার আছে। শুনে যান [কান্না]

শুক্তিমতির বেশধারী মালবিকা স্টেজের মাঝখানে দাঁড়িয়ে কাঁদছে। আবহ সংগীত সমস্ত পরিবেশকে করুন রসে ভরে তুলেছে। পর্দা পড়েছে। দর্শকরা তখন-ও অবাক বিস্ময়ে মালবিকা'র দিকে তাকিয়ে আছে। তারপর এক সময় স্বতস্ফূর্ত করতালিতে সমস্ত প্রেক্ষাগৃহ কেঁপে উঠলো।

॥ ১১ ॥

এক ঝাঁক বুনো হাস অশ্বত্থ গাছটা থেকে উড়ে চলে গেল। ঝট্ পট শব্দ হল। মালবিকা চমকে উঠলো। আশ্রমের প্রান্তের অশ্বত্থ গাছটার নীচে এসে নির্জন দুপুরে দিবাস্বপ্ন দেখেছিল। কিন্তু মালবিকা তো ঘুমায়নি যে স্বপ্ন দেখবে। তবে হয়ত উদবিগ্ন চিত্তের বিভ্রম। জেগেই ছিল মালবিকা তাকিয়েছিল শূন্য পানে। দেখছিল তার শূন্য জীবনের চারদিকে শুধু

ধূ-ধূ করছে। স্বামী তাড়িত সংসারে আজীবন শূন্যতার মাঝখানে সে দাঁড়িয়ে আছে। আর চারদিকে শূন্যতা, অপমান, ব্যর্থতা। এই সব দেখতে দেখতে মালবিকা অনেক পিছনে চলে গিয়েছিল। সেই অভিনয় জীবনের দিনগুলোর কথা ভাবছিল। হঠাৎ বুনোহাঁসের পাখার ঝট পট শব্দে সম্বিত ফিরে পেল। একটা অজানা আশংকায় তার বুকটা ধ্বক্ করে উঠলো। ছুটে গেল আশ্রমের মধ্যে। দেখল কুটিরের দ্বারে স্বামী ভৈরবানন্দ তার শিশুর শয্যার পাশে বসে তেজদীপ্ত চোখে ঘুমন্ত শিশুর মুখের দিকে তাকিয়ে রয়েছে। মালবিকা দেখল যেন সেই বসুরাজ শুক্তিমতির সন্তানকে সহ্য করতে পারছে না। হয়তো এখুনি ঐ শিশুকে হত্যা করবে।

মালবিকা চীৎকার করে ওঠে—না।

চম্‌কে উঠলেন ভৈরবানন্দ। কি হল মা? এমন চেঁচিয়ে উঠলে কেন-ও?

মালবিকা তার উদবিগ্ন চিত্তের বিভ্রম সংশোধন করে বলল, না আপনি খোকার মুখের দিকে তাকিয়ে—

—হ্যাঁ দেখছিলাম।

—কি দেখলেন?

মালবিকার উৎকণ্ঠা দেখে ভৈরবানন্দ স্মিতহাস্যে বলেন, না না কোন অশুভ ইঙ্গিত নেই তবে—তোমার সন্তান নাস্তিক হবে।

— গুরুদেব!

—ঈশ্বরে ওর বিশ্বাস থাকবে না।

মালবিকা আর কোন কথা না বলে শিশুকে নিজের কোলে নিয়ে বুকের মধ্যে নিবিড় করে জড়িয়ে ধরল। চুম্বন আঁকলো। হোক্ তার সন্তান নাস্তিক, তবু তো তারই সন্তান। শুক্তিমতি যেমন সন্তান গিরিকাকে অস্বীকার করতে পারেনি মালবিকাও তার রাজেশ (রাজ) কে অস্বীকার করতে পারবে না। রাজ তার রক্তের সন্তান। রাজু তার প্রাণ। রাজকে বড় করে মানুষ করবেই। তারপর একদিন চট্টোরাজ পরিবারের সাথে রাজে'র কি সম্পর্ক তা জানিয়ে দেবে। বংশের ছেলেকে বংশে ফিরিয়ে দেবে। তারপর মালবিকা?—এই মন্দিরে সেবিকা ব্রত পালন করে বাকী জীবন কাটিয়ে দেবে।

॥ ১২ ॥

বংশ মার্য্যাদা আর আভিজাত্যের অহংকারে বিজনবাবু তাঁর একমাত্র পুত্র প্রসূনকে ত্যাগ করলেও অন্তরে অন্তরে তিনি আহত। প্রসূনের মা রমলাদেবী, তিনি নারী, মা, তাঁর কথা নতুন করে বলার অবকাশ থাকে না। পৃথিবীর সব মায়ের প্রাণ সব সন্তানের জন্য সমান কাঁদে। সে পুত্র যেমনই হোক। রমলাদেবী কৃশ হয়েছেন। ভাবনায় চিন্তায় চোখের কোণে কালি পড়েছে। শত চেষ্টা করেও প্রসূনের কোন সন্ধান পেলেন না। আজ প্রায় তিন বছর হল প্রসূন বাড়ী ছাড়া। এই তিন বছরেই বিজনবাবু ও রমলাদেবীর বয়স যেন ত্রিশ বছরেরও অধিক বেড়ে গেছে। বৃদ্ধ চাকর রঘু একদিন বলল,—কর্ত্তাবাবু আমি বলি কি আপনারা কিছুদিন তীর্থে ঘুরে আসুন। তাতে যদি মনটা একটু শান্ত হয়।

রঘুর কথা শুনে বিজনবাবু মনে মনে চিন্তা করলেন রঘু কথাটা মন্দ বলেনি। তাই একদিন ওরা বেড়িয়ে পড়লেন। সমস্ত বাড়ী আগলে রইল ঝি-চাকরেরা।

॥ ১৩ ॥

এদিকে সমীরের চেষ্টায় প্রসূন জব্বলপুর ভিহিকেলস্ ফ্যাক্টরীতে একটা চাকরী পেল। চাকরী আর সমীরের সাথে শিকার করেই দিন কাটায়। একদিন ওরা সকলে মিলে মার্বেল রক, চৌষাট যোগিনীর মন্দির আর ভেড়াঘাটে বেড়াতে গেল। ভেড়াঘাটের কাছে নর্ম্মদা ফলস্ দেখে নন্দিতা আনন্দে গান গাইছিল—

"আছে, সব লেখা আছে—একমুঠো সময়ের এই যে জীবন, কখন ফুরাবে কে জানে? এই চোখের পলকে—কাছে এসে হারিয়ে যাওয়া—

স্বপ্নের মতো স্বপ্ন নিয়ে

রঙীন মশাল কিছু দিলে জ্বালিয়ে—

সেই আলোতে যে আগুন ছিল, কেউ আমায় বলেনি ডেকে······

বুঝিনি ফুলের সুগন্ধ উধাও হবে

ভাবিনি ফুলের বুক হবে যে পাথর।

ভালবাসা আজ ভুল হয়ে গেল—চেনা সে সুরে, তুমি গাইলে না—

সে সুর কোথায় হারিয়ে গেল।

আমার মনের সুরে জাগে পুলক—মনে হয়
তুমি আমায় (আজও) কতো ভালোবাসো
আছে, সব লেখা আছে……।”

কিন্তু প্রসূনের চোখে তখন নন্দিতা মালবিকা হয়ে গিয়েছে। মালবিকা গান গাইছে—নদীর জলে পা ডুবিয়ে বসে আছে। পাথরের ওপর—খিল্ খিল্ করে হাসছে। প্রসূনও হাসছে। মালবিকার সাথে গান গাইছে—

সমস্ত স্বপ্ন ভেঙ্গে গেল। তখনই, যখন সমীর প্রসূনের হাত ধরে টেনে নিয়ে গেল, বলল—এই প্রসূন এখানে চুপ করে বসে আছিস যে। চল্—

—কোথায় যাবো ?

—বোটিং করব—নন্দিতা ধরেছে ও নৌকা চাপবে। তারপরে ওরা তিনজনে বোটিং করল। চৌষাট যোগিনীর মন্দির—এ উঠলো। এইভাবে বেড়ানো আর আনন্দের শুকনো অনুভূতিতে প্রসূনের দিন কাটছে। তবু ও প্রসূন আগের চেয়ে অনেক স্বতন্ত্র, অনেক বদলে গেছে। সহজে হাসে না। সহজে কথা বলে না। এই সব লক্ষ্য করে নন্দিতা একদিন ওর স্বামী সমীরকে বলল,

—এই শুনছো ?

—সমীর বন্দুকের নল পরিস্কার করতে করতে বলল, হুঁ।

—আচ্ছা, প্রসূন ঠাকুরপো'র কি হয়েছে বলো তো ? আজকাল কেমন যেন মনমরা হয়ে থাকে। অফিস থেকে ফিরে এসে, শুধু বারান্দায় পায়চারি করে।

—হুঁ…দাঁড়ি কামায় না, চোখে একটা মোটা ফ্রেমের চশমা লাগিয়েছে…

হুঁ…

—কি তখন থেকে শুধু হুঁ-হুঁ করছ। রাখোতো বন্দুকটা—বলেই বন্দুকটা কেড়ে নিল।

—এই, আরে নিও না দাও। এখনো পরিস্কার করতে বাকী আছে। দাও বন্দুকটা এমন সময় ঘরে প্রবেশ করে প্রসূন বলে—কি হ'ল অতো চেঁচা মিচি কিসের ? সমীর কপট রাগ দেখিয়ে বলল, চেঁচামেচির গোড়া তুমি ?

—আমি। প্রসূন বিস্মিত।

—হ্যাঁ, হ্যাঁ তুমি ? তুমি কেন আজকাল মনমরা হয়ে থাক ? কেন দাড়ী কামাও না ? এসবের উত্তর নন্দিতাকে মানে তোমার ঐ বৌঠানকে দিতে হবে।

নন্দিতা বলে—মোটেই না। আমি মানে—

প্রসূন মৃদু হেসে বলল বুঝেছি। আমার সম্বন্ধে কিছু একটা গোপন আলোচনা চলছিল। আমি এসে পড়ায় সে আলোচনায় ধামা চাপা দিয়ে তোমরা বন্দুক কাড়াকাড়ি করতে ব্যস্ত হলে—

সমীর মাথা নেড়ে বলল— না ভাই! ও সব ধামা চাপার ব্যাপারে আমি নেই। আমি সবকিছু ওপেনলি বলতে ভালবাসি। তাই বলছিলাম কি, একটা বিয়ে করে ফেল, তা'হলে আর তুমি মন মরা হয়ে থাকবে না। গিন্নির ধমকে প্রতি রাত্রে দাড়ি কামাতে হবে-- যেমন তোমার এই বৌঠান ধমক দিয়ে প্রতি রাত্রে আমায় দাঁড়িয়ে তবে—

নন্দিতা বলল আঃ! কি হচ্ছে কি?

আমার বন্দুক দাও, তাহলেই মিটে যাবে।

নন্দিতা বন্দুকটা ছুঁড়ে দিয়ে বলল—এই নাও তোমার বন্দুক, শুধু শিকার আর শিকার। ভারী আমার শিকারী হয়েছে। সমীর বন্দুকটা লুফে নিয়ে বলল—হুঁ হুঁ পাকা শিকারী না হলে তোমার মত সিংহীকে পাকড়াও করলাম কি করে?

কি বললে, আমি সিংহী······তবে রে: চোখ পাকিয়ে কোমরে কাপড় বেঁধে সমীরের দিকে ছুটে যায়, সমীর বলল—এই রে! মুশকিল করেছে। সিংহী যে আমার দিকে এগিয়ে আসছে! কিন্তু আমার বন্দুকের ট্রীগার যে জ্যাম্ করেছে। অতএব প্রস্থান করাই উচিৎ। এক হাস্যকর পরিবেশ সৃষ্টি করে সমীর ঘর থেকে বেড়িয়ে গেল। প্রসূন হাসতে হাসতে বলল, সমীরটা চিরদিনই রসিকে রয়ে গেল। নন্দিতা বলল, কিন্তু তোমার মুখ আজকাল গোমরা হয়ে থাকে কেন? এখন ভি, এফ, জে'র ম্যানেজিং ডাইরেক্টর হয়েছ, তার মেজাজী চাল না হয় ফ্যাকটরিতে দেখাবে। তাই বলে বাড়ীতেও? আমি বলি কি এবার একটা বিয়ে কর। এখানে আমার সন্ধানে একটা ভাল বাঙ্গালী মেয়ে আছে, দেখতে শুনতে—

প্রসূন ততক্ষণে অন্য জগতে চলে গেছে। নন্দিতার কোন কথা আর প্রসূনের কানে যায় না, সে মনে মনে বলে—আমার চোখের প্রতিটি পলকের মাঝে যে দৃষ্টি আছে, সে দৃষ্টি দেখতে পায় শুধু একটা মুখ—মালবিকা'র। মালবিকার চোখের মিনতিভরা দৃষ্টির অন্তরালে যে চাপা অভিযোগগুলি ফুটে

উঠে ছিল তার সম্মুখীন হবার জন্য আমাকে প্রস্তুত হতেই হবে। আমি যে মালবিকার কাছে অপরাধী, ক্ষমাপ্রার্থী।

॥ ১৪ ॥

নন্দিতা পারেনি প্রসূনকে রাজী করাতে। আরো অনেকগুলো দিন কেটে গেল। একদিন প্রসূন আর সমীর দু'জনে শিকারে বাহির হল। সমীরের সেই বহু আশার—'কিস্‌লি কালহার জঙ্গলে।'

সাউথ মাণ্ডলোর ডিভিশন্যাল ফরেস্ট অফিসারের সঙ্গে সমীর যোগাযোগ করে সেখানে একরাত থাকবার ব্যবস্থা করে নিয়েছে।

জব্বলপুর টাউন থেকে গাড়ী ছেড়ে দীর্ঘ পঁচাত্তর কিঃ মিঃ পথ অতিক্রম করে মাণ্ডালা পেট্রল পাম্পে গেল, গাড়ীতে তেল নিয়ে আবার তেইশ কিঃ মিঃ পথ পাড়ি দিয়ে ওরা কিস্‌লি কালহায় পৌঁছাল। ডিভিশন্যাল ফরেস্ট অফিসারের সঙ্গে দেখা করে তাঁর বাংলোতেই ওরা দু'জন একবেলা কাটিয়ে দিল। তারপর জঙ্গলে ঘুরতে ঘুরতে সমীর বলল—এই হল কিসলি কালহা, বুঝলি? প্রসূন: হ্যাঁ, তা তো বুঝলাম। কিন্তু তুই যে বললি এখানে চিতা বাঘ পাওয়া যায়? ধীরে প্রসূন, ধীরে, রাতটা হতে দে?

ওরা দু'জনে পুনরায় বাংলোতে চলে গেল। রেঞ্জার সাহেবের বাংলো থেকে ওদের বাংলোটা একটু তফাতে। সন্ধ্যার পর সেখানেই আশ্রয় নিল। রেঞ্জার সাহেবের চাকরটা এসে বলল—"বাবু, আপলোগকো, সাহাব রাত কা খানা খানে কে লিয়ে পুকার কিয়া।" রাত্রে দু'জনেই রেঞ্জার সাহেবের বাংলোতে খেয়ে এল। তাপর বাংলোর ঘরে শুয়ে পরল। সারাদিন ড্রাইভিং করে প্রসূনের খুব টায়ার্ড (ক্লান্তি লাগছিল—তাই শোবার সঙ্গে সঙ্গেই ঘুমিয়ে পড়লো। সমীরেরও ঘুম এসেছিল, কিন্তু সজাগ। একটা শব্দ হল ঝুপ করে শব্দ হল। সমীর জেগে উঠলো, একবার প্রসূনকে ডাকলো, কিন্তু কোন সাড়া না পেয়ে সমীর ঘরের দরজা খুলে বাহিরে বেরিয়ে এল, হাতে বন্দুক। বাহিরের আকাশে চাঁদ বাংলো সংলগ্ন এলাকাটা চাঁদের আলোয় আলোকিত। বাংলোর ঠিক পিছন দিকেই একটা জঙ্গল। একটা খস্‌ খস্‌ শব্দকে অনুসরণ করে সমীর বাংলোর পিছন দিকে গেল। আবছা চাঁদের আলোয় দেখল— একটা চিতাবাঘ ডোবার দিকে যাচ্ছে। বোধহয় জল খেতে, সমীর তাক করল, বন্দুকের নল ফায়ার করল পরপর দুটো। অভ্রান্ত নিশানা, কিন্তু কোথা

থেকে অন্য একটা চিতাবাঘ সমীরের ঘাড়ে……সমীর মাটিতে পরে গেল। হাত থেকে বন্দুকটা ছিটকে গেল দূরে, বাঘটা অন্ধ আক্রোশে সমীরকে আক্রমন করল, অসহায় সমীর খালিহাতে বাঘের আক্রমণ ঠেকাতে চেষ্টা করতে লাগল। বন্দুকের আওয়াজে প্রসূনের ঘুম ভেঙ্গে গেল—দেখল, সমীর বিছানায় নেই। প্রসূনের সন্দেহ হল—বন্দুকটা নিয়ে বাহিরে এল, তারপর বাহিরে আসতেই বাঘের গর্জন আর সমীরের আর্তনাদ শুনে ছুটে গেল ডোবার দিকে, দেখল—বাঘ আর সমীরের লড়াই। পরপর শূন্যে দুটো ফায়ার করল। বাঘটা একবার যেন পিছন ফিরে তাকাল, প্রসূন লক্ষ্য করে ফায়ার করল। অব্যর্থ লক্ষ্যভেদ—বাঘটা যেন সমীরের দিকে ছুটে আসছে। প্রসূন আরো দুটো ফায়ার করল, বাঘটা লুটিয়ে পড়ল। সমীর হস্‌পিট্যালে। অবস্থা খুবই আশংকাজনক। দুটো দিন কোনরকমে বেঁচে রহিল, নন্দিতা তখন সম্পূর্ণ গর্ভবতী।

সমস্ত শুনে চীৎকার করে উঠলো,—না।

কিন্তু সমীরকে বাঁচানো গেল না, নন্দিতা একেবারে ভেঙ্গে পড়ল। মূর্চ্ছা গেল, তাকেও হসপিট্যালে ভর্তি করা হল, তার সন্তান ভূমিষ্ঠ হবে। তাই প্রসবকালীন এবং স্বামীশোকে মূর্চ্ছা দেখা দিল।

ডাক্তার একজন নার্সকে বললেন—একোনাইট সিক্স নিয়ে আসুন। কুইক! আদেশ পেয়ে নার্স (মহিলা) ঔষধ নিয়ে এলেন। ঔষধ প্রয়োগে ডাক্তার বাবু রোগীর অবস্থার উন্নতির লক্ষণ দেখতে পেলেন না। বললেন—এখুনি সিজোরিয়ান না করলে পেটের সন্তান তো বটেই মা'কেও বাঁচানো সম্ভব নয়।

নন্দিতার সন্তানকে সিজারিয়ন করেই বাহির করা হল। কিন্তু নন্দিতার অবস্থা আশংকাজনক বিপদ কাটেনি। আজ প্রায় সাতদিন হসপিট্যালে ভর্ত্তি আছে। প্রসূন প্রতিদিনই হসপিট্যালে আসে নন্দিতাও শিশুকন্যাকে দেখতে আজও এসেছে। বারান্দার এক নার্সের সাথে দেখা হতেই জিজ্ঞাসা করল উনি কেমন আছেন ?

—উই আর ভেরি সরি প্রসূনবাবু!

—সিসটার! প্রসূন আর্ত চীৎকার করে উঠলো।

পৃথিবীতে প্রসূন দ্বিতীয়বার একা হল। সমস্ত জীবনটাই হয়তো তাকে এভাবে একা একা কাটাতে হবে। প্রসূন হসপিট্যালের করিডর ধরে

নন্দিতার কেবিনের দিকে গেল। পর্দা সরিয়ে কেবিনে ঢুকলো। একটা সাদা কাপড়ে সর্বাঙ্গ ঢাকা···প্রসূন শ্লথ গতিতে বেডের কাছে গেল। মুখের কাছের কাপড় সরিয়ে নন্দিতার ঘুমন্ত মুখের পানে তাকিয়ে। তারপর নন্দিতার এলায়িত ডান হাতটা ধরে কান্নায় ভেঙ্গে পড়ে বলল, বৌঠান তুমি, তোমরা সবাই চলে গেলে। আমায় একা ফেলে রেখে চলে গেলে। প্রসূন কাঁদছে।

একজন সিসটার এসে বলল, 'প্রসূনবাবু উনি একটা চিঠি লিখে রেখে গেছেন। এই নিন।'

প্রসূন হাত বাড়িয়ে চিঠিটা নিল তারপর খুলে দেখল।

'সুপ্রিয় ঠাকুরপো, তোমার দাদা আগেই গেছেন। আমিও বোধহয় পা বাড়ালাম। রেখে যাচ্ছি আমাদের শিশুকন্যাকে। তুমি ওকে মানুষ করো। ওর সমস্ত দায়-দায়িত্ব তোমার ওপরেই ছেড়ে দিলাম। তুমি-ই ওর বাবা-মা অভিভাবক হয়ো। তবে আমার আশানুযায়ী ওর নাম দিও দীপান্বিতা।' ইতি—তোমার বৌঠান।

চিঠি পড়ার পর প্রসূন আর একবার নন্দিতার পানে তাকাল। তারপর সিসটারকে বলল—'বেবী কোথায়?'

—আপনি নিয়ে যাবেন 'বেবী'কে?

—হ্যাঁ, নিয়ে যাব।

—আমার সঙ্গে আসুন।

প্রসূন সিস্টারকে অনুসরণ করল। প্রথমে অফিসে গিয়ে কতকগুলো ফরমে সাইন করে শিশুকন্যা 'দীপান্বিতা'কে নিয়ে বাড়ী ফিরে গেল।

কয়েকদিন পর নন্দিতার মৃতদেহ পেয়ে প্রসূন দাহ কার্য সমাপ্ত করল। তারপর শিশুকন্যাকে মানুষ করার জন্য 'মহা-দায়িত্ব' হাতে নিল। একজন আয়া রাখল। বাড়ীতে ঝি-চাকরের সংখ্যা বাড়লো। প্রসূন পরের ঘরে আপন বাসা বাঁধলো। দেখতে দেখতে আরও বিশবছর কাটলো।

॥ ১৫ ॥

রাজেশ বড় হল। অনিমেশবাবুর তত্ত্বাবধানে লেখাপড়া শিখলো। কিন্তু কোনদিন বাবার পরিচয় জানতে চায়নি। কারন জ্ঞান হওয়া অবধি দেখেছে মায়ের দুঃখ। মা যেন একটা 'দুঃখের মূর্ত্তি'।

—একদিন জিজ্ঞাসা করেছিল কিন্তু মালবিকা কোন উত্তর না দিয়ে শুধু কেঁদেছিল। তারপর থেকে রাজেশ আর কোনদিন বাবার সম্বন্ধে কিছু জানতে চায়নি। তবে স্বামী ভৈরবানন্দের ভবিষ্যৎ বাণী ঠিক। রাজেশ কোনদিন দৈবকে মানে না। ঈশ্বর বিশ্বাস করে না। একবার ভৈরবানন্দের সঙ্গে এ বিষয়ে তর্ক প্রসঙ্গে বলেছিল—আমার মনে হয়, মানুষ তখনই ঠাকুর দেবতা মানে যখন সে নিজের ওপর আস্থা হারিয়ে ফেলে। মানুষ যখন অসহায় দুর্বল তখনই দেবতার কাছে করুণাভিক্ষা করে।

রাজেশ (রাজ) যখন এইভাবে গুরুদেবের সাথে তর্ক করছিল, তখন মালবিকা ধমক দিয়ে বলেছিল,—রাজ ! গুরুজনদের সাথে তর্ক করতে নেই।

—না মা, তর্ক নয়। আমি বলছিলাম—

—তুমি কি বলবে জানি। তবে এইটুকু শুনে রাখো—'বিশ্বাসে মিলায় বস্তু, তর্কে বহুদুর।' এইকথা বলে মালবিকা কুটিরের মধ্যে প্রবেশ করেছিল। রাজ মায়ের পিছু পিছু কুটিরের মধ্যে প্রবেশ করে মাকে উদ্দেশ্য করে বলল, — তাহলে তুমি যে বিশ্বাস নিয়ে আমায় মানুষ করলে, কই সে বস্তুর তো কোন সন্ধান তুমি আজও পেলে না ?

মালবিকা রাজের (পুত্রের) মুখে হাত দিয়ে বলল,—পেয়েছি রাজ ! তিনি যে তোর মধ্যেই আছে। তাই আমি অন্য কোথাও তাঁকে খুজিনা। বলতে বলতে মালবিকা কান্নায় ভেঙে পড়লো। এভাবেই হাসি কান্নার মধ্যে দিয়ে রাজেশ বড় হয়েছে। আজ সে অর্ডিন্যানস-এ চাকরী পেয়েছে। কয়েক বছর কাজ করার পর অফিস থেকে তাকে বদলি করা হল। মধ্যপ্রদেশের অর্ডিন্যানস্ এর ফ্যাক্টরী ষ্টেট এণ্টারপ্রাইজ খামারিয়াতে প্ল্যানার হিসাবে কাজে যোগ দিতে হবে। এই সংবাদ যেমন আনন্দের বা আনন্দদায়ক তেমনি কষ্টকর। কয়েক বছর মাকে ছেড়ে থাকতে হবে। মালবিকার প্রাণও কাঁদবে। একমাত্র সন্তান। সে ও বিদেশ বিভূই চাকরী করতে যাবে। শোকে, তাপে, রোগে কে দেখবে ? এই চিন্তা মালবিকার মনে, ছেলের মঙ্গল কামনা করে মালবিকা একদিন মায়ের মন্দিরে পূজার ব্যবস্থা করল। সকালে স্নান করে লাল পাড় গরদের শাড়ী পরে কপালে বড় গোলাকার সিঁদুরের টিপ পরে মায়ের মন্দিরে গেল পুজো দিতে। রাজেশ নিজেকে প্রস্তুত করে নিয়ে মন্দির দালানের নীচে দাঁড়িয়ে রইল। মালবিকা মন্দির

থেকে বেরিয়েই দেখল—পুত্র রাজ, তার মন্দির দালানের ঠিক নীচে দাঁড়িয়ে রয়েছে। কিরে রাজ, এখানে দাঁড়িয়ে আছিস যে?

কপট গাম্ভীর্য দেখিয়ে বলল,—রাজেশ তর্ক কর না।

—কি তর্ক?

—বারে! তুমি-ই তো বলেছ জুতোপায়ে মন্দিরে যেতে নেই। সেই জন্যই তো এখানে দাঁড়িয়ে ছিলাম। তুমি নেমে এস-প্রণাম করি। আমার দেরী হয়ে যাবে।

—সহসা মালবিকার মুখটা যেন পাংশু হয়ে গেল।

রাজেশ মায়ের পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করল।

ভৈরবানন্দকে প্রণাম করে ট্যাক্সীতে চাপল। অনিমেশবাবু আগে থেকেই বসেছিলেন। রাজেশের আদেশে ড্রাইভার গাড়ী ছাড়ল।

॥ ১৬ ॥

দীপান্বিতা বড় হয়েছে।

প্রসূন তাকে দীপ' বলেই ডাকে। দীপান্বিতা (দীপ) প্রসূনকে ড্যাডি বলে—প্রসূনকে তার নিজের বাবা (ড্যাডি) বলেই জানে। তবে সময় সময় তার ড্যাডিকে ভীষণ ভয় করে। কারণ দিনের বেলায় প্রসূন কেমন যেন গম্ভীর আত্মসচেতন ও রাশভারী হয়ে থাকে। চোখের দৃষ্টি মোটা দামী সেলুলয়েড ফ্রেমের চশমার মধ্য দিয়ে আরো স্বচ্ছ হয়ে বেরিয়ে আসে। গলার স্বরে রাত্রির আবেগের পরিবর্ত্তে আরো দৃঢ়তা আর সংযম। মুখভর্ত্তি দাড়ি। মাথায় ব্যাক ব্রাশ করা চুল। মানুষটার পানে তাকালে ভয় মিশ্রিত শ্রদ্ধায় মাথানত হয় সকলের। গলার স্বরের গাম্ভীর্য্যতাকে কেউ অস্বীকার করতে পারে না। উপেক্ষা করতে পারে না। বিকেলে রেলিং ঘেরা বারান্দায় পায়চারি করতে করতে ডাকল—দীপ, দীপ!

—দীপান্বিতা তার পড়ার ঘর থেকে সাড়া দিল আসছি! কিছুক্ষণ পরে দীপ প্রসূনের সামনে এল। বছর আঠোরো (১৮) বয়সের কিশোরী কন্যা দীপান্বিতাকে দেখতে ঠিক নন্দিতার মত লাগছে। তবে নন্দিতার চেয়ে বেশী ছটফটে। মিডির অন্তরালের শরীরটাকে দেখলে তাকে যুবতী বলা চলে। পান পাতার মত মুখমণ্ডল। বামদিকের থুতনির নীচে একটা তিল। গোরাদের মত উজ্জ্বল টকটকে ফর্সা গায়ের রং! চমৎকার টানাটানা চোখ দুটিতে দুষ্টুমির প্রাচুর্য ভরা দৃষ্টি। প্রসূনের কাছে এসে বলে,—

—ড্যাডি আমায় ডাকছিলে ?

—হ্যাঁ, নীচে দেখলাম হীরুয়া গাড়ী বার করছে! তুমি কি কোথাও যাবে এখন ?

—হ্যাঁ ড্যাডি, ব্লানঝি বাজারে একটা ফাংশান আছে।

প্রসূন ভ্রূ-কুঞ্চিত করল। বলল—ফাংশান ?

—হ্যাঁ, আজ পঁচিশে বৈশাখ, না ? এখানকার সমস্ত বাঙ্গালী এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছে। জানো ড্যাডি, খামারিয়ারএকজন ইয়ং প্ল্যানার খুব ভাল গান গাইতে পারে। আমাদের কলেজ ফাংশনে তার গান শুনেছি।

—তা, তোমাদের ঐ রবীন্দ্র জন্ম জয়ন্তীতে তাকে ইনভাইট করেছে ?

হ্যাঁ আমরা ক'জন বন্ধু মিলে তাঁর ফ্ল্যাটে গিয়েছিলাম। তিনি আসবেন কথা দিয়েছেন—ড্যাডি, তুমি যাবে ?

—এ্যাঁ, না না আমার শরীরটা তেমন ভাল নয়। তুমি বরং একটু তাড়াতাড়ি ফেরার চেষ্টা করবে। দীপান্বিতা দ্বিরুক্তি না করে চলে গেল।

প্রসূন বাহিরের ব্যালকনিতে এল। দেখল, দীপের গাড়ীটা চলে গেল।

রেলিং ঘেরা ব্যালকনি। রেলিং এর গা বেয়ে উঠেছে একটা গুলমেহেন্দি তলা। ব্যালকনি থেকে বড় রাস্তাটা দেখা যায়।

প্রসূনের যন্ত্রণাকাতর দু'চোখের দৃষ্টি কোন দিকে স্থির থাকছে না কখনো রাস্তার সারি সারি আলোর পানে চেয়ে আছে। কখনো বা তারা-ভরা আকাশের পানে। কখনো দূরে ঘুমন্ত ছোটকালো, পাহাড়ের দিকে তাকিয়ে থাকে। পায়ে পায়ে কখন যে কক্ষসংলগ্ন ব্যালকনির একেবারে দক্ষিণ প্রান্তে চলে এসেছে প্রসূন, সে জানে না। সেখান থেকে কম্পাউণ্ড ঘেরা বাগানটা দেখা যায়। গেটের দু'পাশে দুটো বড় বড় ঝাউগাছ যেন অতন্দ্র প্রহরী। ভিতরে জায়গায় জায়গায় ছোট কম্পাউণ্ড ঘেরা স্তুপাকৃতি নানারকম ফুলগাছ। গাছগুলোর জমাট অন্ধকারে জোনাকির আলোর রহস্যময় পরিবেশের সৃষ্টি করেছে। দোতলার ব্যালকনিতে দাঁড়িয়ে প্রসূন সব কিছু লক্ষ্য করছে। প্রসূনের চেহারা দেখে বয়স বোঝবার উপায় নেই। লম্বা আর দোহারা গঠনের মানুষ। তবে তার চোখমুখ দেখলে বোঝা যায়। তার সমস্ত শরীর জুড়ে একটা ভাঙ্গনের লীলা চলছে। স্নায়বিক যুদ্ধের তাড়নায় তার সমস্ত মুখে রেখা পরেছে। কপালের সামনে ও কানের রগের কাছে দু' একটা চুলে পাক ধরেছে। ঢং ঢং করে দেওয়াল ঘড়িতে দশটা বাজলো।

এখন প্রসূন তাঁর ঘরের মধ্যে আবছা আলো আঁধারিতে একটা পাথরের মূর্ত্তির ন্যায় দাঁড়িয়ে আছে। দেখছে-ঘড়ির কাঁটাটা ঘুরতে ঘুরতে তার ফেলে যাওয়া ঘরগুলোতে আবার ফিরে আসছে। প্রসূন সহসা কি যেন একটা আবিষ্কার করে ফেলল। ডায়মণ্ডকাট কাঁচের হাতল দেওয়া ড্রয়ারটা খুলে এক গোছা চাবি বার করল। তারপর নির্দিষ্ট চাবিটা নিয়ে স্টীলের আলমারিটা খুলল। আলমারির ভিতরে মালবিকার একটি এনলার্জ করা ছবি। সেই ছবিকে উদ্দেশ্য করে প্রসূন ধরা গলায় বলল, "মালবিকা আজ তুমি কোথায় জানিনা। তবে তুমি যেখানেই থাক, একদিন আমি তোমাকে পাবো-ই। এ বিশ্বাস আমার আছে। দেখো মালবিকা, ঘড়ির কাঁটাটা পরপর ঘরগুলোকে ফেলে চলে যাচ্ছে, আবার ফিরে আসছে সেই ঘরেই। হ্যাঁ, মালবিকা হ্যাঁ। আমরাও ঐ ঘড়ির মতোই আমাদের জীবনচক্রে ঘুরতে ঘুরতে একদিন ঠিক মিলিত হবো। সেদিন তোমার কোন অপমান আমি সহ্য করব না। আমার কোন দুর্বলতাকে লোকলজ্জার ভয়ে ঢেকে রাখব না। মালবিকা, সেদিন তোমার সব কৈফিয়ত আমি দেব। তোমাকে আমি……"

হঠাৎ এক শব্দ। মেঝেতে কি যেন টুং করে পরে গেল। শব্দ পেয়ে প্রসূন আচ্ছন্ন জগৎ থেকে রূঢ় বাস্তবে ফিরে এল। দেখল-দরজা ঠেলে দীপান্বিতা ঘরে ঢুকছে। তবু প্রশ্ন করল, কে ওখানে?

—আমি!

—ওঃ দীপ! প্রসূন আলমারি বন্ধ করল।

—ড্যাডি, এতরাত্রে কার সাথে কথা বলছিলে?

প্রসূন বিষয়টাকে চাপা দিতে চাইল। কেমন যেন কাঁচুমাঁচু করে বলল,

—এ্যাঁ, কথা!

—দীপান্বিতা দৃঢ়তার সঙ্গে প্রশ্ন করল,—আলমারির ভিতরে ছবিটা কার?

—ছবি?

দীপান্বিতা আলমারিটা খুলে দেখিয়ে বলল,—হ্যাঁ এই ছবিটা কার?

—ওটা ··ও···টা···

ওঃ ড্যাডি-তুমি এত নিষ্ঠুর? কেন-কেন-ও? কেন এতদিন তুমি মায়ের কথা লুকিয়েছিলে?

—শোনো দীপ! শোনো···

আমি কতদিন মায়ের জন্য কেঁদেছি! তবু—

—আমার কথাটা শোনো দীপ···

দীপান্বিতা যেন উন্মাদ প্রায়। কেঁদে প্রসূনের গলা জড়িয়ে ধরে প্রসূনকে দু'চার ঘা দিয়ে বলল—কতদিন মায়ের একটা ছবি'র কথা বলেছি তুমি বলেছ নেই। কেন?

—দীপ, আমার কথাটা শোন, পাগলামি কোর না···

—না, আমি কোন কথা আর শুনতে চাই না। তুমি নিষ্ঠুর পাথর 'ইউ আর নো বেটার দ্যান্ এ স্টোন'। ড্যাডি, ইউ আর নো বেটার দ্যান এ স্টোন্।

দীপান্বিতা কাঁদতে কাঁদতে মালবিকার ছবিটা জড়িয়ে ধরল-মা-মা গো। প্রসূন দীপান্বিতাকে বোঝাতে চেয়েছিল। কিন্তু দীপ সে অবসর দিল না। একটা সরল বিশ্বাসে মালবিকাকে তার মা ভেবে প্রসূনকে দোষারোপ করতে লাগলো। জন্ম থেকে মাতৃস্নেহে বঞ্চিতা দীপান্বিতা আজ হঠাৎ মালবিকার প্রতিকৃতিকে নিজের জন্মদাত্রী মা ভাবলো। প্রসূনও তার সরল বিশ্বাসে আর আঘাত দিতে চাইল না।

॥ ১৭ ॥

দীপান্বিতার সঙ্গে রাজেশের ঘনিষ্ঠ পরিচয় হয়েছে। ফাংশনে দু'জনেই গান গেয়েছে। তবে রাজেশের গানের প্রশংসায় সকলেই পঞ্চমুখ। অনেক অবাঙ্গালীও এই রবীন্দ্র জন্ম জয়ন্তীতে যোগ দিয়েছিল। তারা সকলেও রাজেশের গানের প্রশংসা করেছে। গানের শেষে রাজেশ দীপান্বিতাকে বলেছিল—আমার কিন্তু নজরুল গীতি গাইতে ভীষণ ভাল লাগে। দীপ বাচ্ছা ছেলের মত খুশির উচ্ছাসে বলেছিল—আমারও।

তারপর একসময় রাজেশকে নিমন্ত্রণ করল—ওদের বাড়ী আসবার জন্য। অবশেষে একদিন দীপান্বিতা রাজেশকে যেন ধরে বেঁধে নিয়ে এল বাড়ীতে। প্রসূন তখন ঘরের মধ্যে একটা ম্যাগাজিন দেখছিল। দীপান্বিতা রাজেশকে নিয়ে সোজা প্রসূনের ঘরে প্রবেশ করল। বলল,—ড্যাডি এই দ্যাখো কাকে নিয়ে এসেছি? এই হচ্ছে রাজ মানে রাজেশ। এবার রাজেশের দিকে তাকিয়ে বলল,—আর রাজ্, ইনি হচ্ছেন আমার ড্যাডি।

প্রসূন একদৃষ্টে রাজেশের মুখের দিকে তাকিয়ে রইল, একটা চিরপরিচিত মুখের মিল খুঁজে পাচ্ছে। আবেগে থর থর দুটো হাত রাজেশের গালের

ছু'পাশ থেকে একটা অন্ধ স্নেহে, নিবিড় চুমু দেবার অদম্য আকাঙ্খাকে দমন করতে পারে না।

—কি দেখছেন? রাজেশ মৃদু হেসে প্রশ্ন করল।

—এঁ্যা-না মানে...প্রথমে কেমন যেন বিভ্রান্ত হয়েছিলাম।

—তোমারই নাম রাজেশ?

—আজ্ঞে হঁ্যা। রাজেশ প্রসূনের পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করে।

—থাক, থাক। প্রণাম করতে হবে না। শুনেছি তুমি এখানে নূতন এসেছ, কি কর?

—স্টেট এণ্টার প্রাইজ খামারীয়া ফ্যাকট্রিতে প্ল্যানারের কাজ করি।

—আই মিন আর্ডিন্যানস্।

—ইয়েস।

দীপান্বিতা বলল,—ড্যাডি তুমি রাজেশের গান শুনবে বলেছিলে?

—হঁ্যা, রাজেশ তুমি নাকি ভাল গান গাইতে পার? শোনাও তো আমায়—না না, আগে কিছু খেয়ে নাও, তারপর।

—রাজেশ আপত্তি জানালো। কিন্তু কোন আপত্তি টিঁকলো না। তাই খাওয়া দাওয়া করেই রাজেশ ও দীপান্বিতা পিয়ানোর কাছে গেল।

রাজেশ বলল,—দীপ তোমাকেও আমার সঙ্গে গাইতে হবে।

দীপান্বিতা মৃদু হেসে সম্মতি জানালো।

রাজেশ গান ধরল—"হাসি মুখে বাসি ফুল ফেলে তুমি দিলে......" এককলি গাইবার পর দীপান্বিতা দ্বিতীয় কলি ধরলো—"কেন তবে ডেকেছিলে উৎসব সভাতে, অবহেলা ভরে যদি ফেলে দেবে প্রভাতে।"

প্রসূন যেন হঠাৎ বুকের মধ্যে তীব্র যন্ত্রনা অনুভব করল, দেখল যেন মালবিকা প্রসূনকে জিজ্ঞাসা করছে —'কেন তবে ডেকেছিলে উৎসব সভাতে। বরণ করে যদি গ্রহণ করতে না পারবে তবে কেন প্রণয়ের মালা গলায় দিলে? মনে পড়ে যায় বরণ কালের সমস্ত ঘটনাবলী। প্রসূন আর সহ্য করতে পারছে না। গান এক সময় শেষ হবার পরই সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠতে গিয়ে দম আটকে পড়ে যাচ্ছিল। রাজেশ—দীপান্বিতা ছুটে এল। প্রসূনকে ধরল। ধরে ধরে প্রসূনকে ঘরের বিছানায় শুইয়ে দিল। তারপর রাজেশ ডাক্তার আনলো। ডাক্তার ঔষধ দিয়েছেন। তবে পুরোপুরি বিশ্রামের জন্য বলেছেন। রাত হল-রাজেশ চলে গেছে। দীপান্বিতা (দীপ) ড্যাডির

শিয়রে সর্ব্বক্ষণ বসে রয়েছে। চাকর বাকরেরা সেবা শুশ্রূষায় ব্যস্ত। দীপান্বিতার ঘুম পাচ্ছে। কিন্তু প্রসূনের অস্থিরতা ঘুমোতে দিল না। প্রসূন যেন ঘুমের ঘোরেই মালবিকার নাম করছে।

দীপান্বিতা বলল—"ড্যাডি ট্রাই টু ফরগেট ইয়োর পাষ্ট।"

প্রসূন উঠে বসল। বলল,—বাট হাউ? কেমন করে দীপ?

—ইউ মাস্ট ড্যাডি, তোমাকে ভুলতেই হবে! অতীতকে নিয়ে কেন তুমি কষ্ট পাবে? পাস্ট ইজ্ পাস্ট—

—না দীপ না। তুমি অতীতের দোহাই দিয়ে আমার কাছ থেকে সব কিছু কেড়ে নিও না। অতীতের দিনগুলো আমার যন্ত্রণা। তবু আমার ভালো লাগে। ওকে তুমি ভুলতে বোলনা দীপ। আমি ভুলতে পারবো না। প্রসূন যেন একটা শিশুর মতো কাঁদতে লাগল।

দীপান্বিতা বোঝাবার চেষ্টা করেও পারে না।

॥ ১৮ ॥

আজ কাল সন্ধ্যার পর না হলে দীপকে বাড়ীতে পাওয়া যায় না। প্রতি দিন বৈকালে অফিস থেকে ফিরে এসে প্রসূন চাকরের কাছে খোঁজ নেয়। গাড়ী থেকে নেমেই গম্ভীর মেজাজী গলায় জিজ্ঞাসা করে, হ্যাঁ রে জগলাল, দীপ কলেজ থেকে ফিরেছে?

—জগলাল ভয়ার্তকণ্ঠে বলে জী, নেহি সার।

প্রসূন আর কিছু বলে না। নিজের ঘরে চলে গেল। বেয়ারা এসে খাবার দিয়ে গেল। প্রসূন কিন্তু খেলো না। জগলালকে ডাকল।

জগলাল এলে প্রসূন বলল—এই খাবারগুলো চাপা দিয়ে যা। আর দীপ এলে, আগে আমার সঙ্গে দেখা করতে বলবি।

নির্দ্দেশমত কাজ করে জগলাল চলে গেল।

প্রসূন ঘরের মধ্যে সোফাটায় গা এলিয়ে দিয়ে একটা সিগারেট ধরালো। চিন্তান্বিত মুখাবয়ব থেকে একটা ধোঁয়ার কুণ্ডলী পাক খাচ্ছে। প্রসূন তাকিয়ে আছে সেই কুণ্ডলীর দিকে।

রাজেশ আর দীপান্বিতার মধ্যে যে প্রণয় পর্ব শুরু হয়েছে সেটা প্রসূন ভালভাবেই বুঝতে পারে। কিন্তু নিজেকে দিয়ে রাজেশকে বিচার করতে গিয়ে প্রসূন চমকে ওঠে। নানা এ হতে পারে না। দীপের এত খানি

সর্বনাশ প্রসূন সহ্য করতে পারবে না। তাই প্রসূন দীপকে ঠিক শাসন করতে না পেরে কেমন যেন অসহায়। আজ পর্যন্ত কোনদিন সে দীপকে শাসনের চোখ দেখায় নি, চড়া স্বরে কথাও বলেনি। আজ দীপের ব্যবহার দেখে, দীপের স্বাধীনতা দেখে, প্রসূন চিন্তান্বিত।

কিন্তু দিন আর রাতের মধ্যে প্রসূনের অনেক তফাৎ। দিনের আলোয় সে সম্পূর্ণ বস্তুতান্ত্রিক জগতের মানুষ। সব কিছুকে বিচার করে কথা বলে। রাত্রে কিন্তু সম্পূর্ণ অন্য ধরনের মানুষ। দিনে বেলায় যে মানুষ তার সাথে কথা বলতে ভয় পায়, রাত্রে সে কথা বলতে পারে। দিনের বেলায় প্রসূনের মধ্যে একটা দৃঢ়তা প্রকাশ পায়। মুখের মধ্যে নিষ্ঠুর কাঠিন্যের ছাপলক্ষ্য করা যায়। আজ সন্ধ্যা পর্য্যন্ত অপেক্ষা করেও দীপান্বিতা যখন এলো না, তখন প্রসূন তার ঘর থেকে দোনলা বন্দুকটা নিয়ে গাড়ী চেপে বেরিয়ে গেল। বাড়ীর চাকর বাকরেরা ভয়ে 'থ' কারো মুখে কোন কথা নেই। আজ বহুদিন হল যে মানুষ বন্দুক স্পর্শ করেনি আজ হঠাৎ-ই বন্দুক নিয়ে নিজে গাড়ী ড্রাইভ করে কোথায় যেন বেড়িয়ে গেল। গাড়ীর শব্দ শুনে ড্রাইভার ছুটে এল। কিন্তু ততক্ষণ গাড়ী ঝরের গতিতে বেরিয়ে গেল। সমস্ত চাকর-বাকরেরা নিজেদের মধ্যে কানাকানি করতে লাগল।

প্রসূন জানতো দীপ আর রাজ কোথায় বেড়াতে যায়। গাড়ী নিয়ে প্রসূন খাগারিয়া পার হয়ে চলেছে সেই বাগানের উদ্দেশ্যে। উত্তেজনার বশে মানুষ অনেক কিছু করতে পারে। প্রসূন হয়ত একসঙ্গে দীপ আর রাজকে গুলি করতে পারতো। কিন্তু বাগানের মধ্যে যে 'প্রেমময়' দৃশ্য প্রসূন দেখলো তাতে বন্দুকের ট্রিগারে হাত উঠলা না।

দীপ রাজ দু'জনে হাত ধরা ধরি করে গান গাইতে গাইতে এগিয়ে আসছে। প্রসূন ওদের মধ্যে একটা পবিত্র প্রেমের আলো দেখতে পেল। বন্দুকের নলের এইম্ স্থির করে রইল। হঠাৎ ফায়ারিং হতেই প্রসূন চীৎকার করে উঠলো—দীপ! প্রসূনের হাত কেঁপে গিয়েছিল। ফায়ারিং এর শব্দে দীপ-রাজ চম্‌কে ওঠে। দীপান্বিতা আরও চম্‌কে উঠেছিল প্রসূনের গলা শুনে-ওরা ছুটে এল প্রসূনের কাছে।

প্রসূন বলল,—রাজ আমাকে তুমি ক্ষমা কর! ক্ষমা কর—

রাজেশ তো অবাক্! বলে-এ আপনি কি বলছেন?

—হ্যাঁ, আমি ঠিকই বলছি। তুমি আমাকে ক্ষমা কর। আমি অনেক

ভুল ধারনা করেছিলাম। ভেবেছিলাম তুমি আমারই মতো……প্রসূন থেমে গেল। তারপর যেন নিজেকে সামলে নিয়ে বলল, আচ্ছা রাজ তুমি যদি জানতে পার যে 'দীপ' একটা অজ্ঞাত কুলশীলা?

—দীপান্বিতার কণ্ঠ চিরে আর্তস্বর বেরিয়ে এল, ড্যাডি!

—রাজেশ যেন শিউরে উঠলো। প্রসূন আবার বলল,—হ্যাঁ রাজ তুমি বল, আজ যদি তুমি জানতে পার দীপ যে পরিচয়ে আছে ওটা তার আসল পরিচয় নয়। যদি জানতে পার যে দীপের জন্ম পরিচয় অত্যন্ত জঘন্য—যদি জানতে পার দীপ একটা অভিনেত্রীর মেয়ে। যদি তোমার সমাজ দীপকে স্বীকার না করে? তুমি তখন কি করবে? বল রাজ, বল তুমি কি তখন দীপকে—

প্রসূনের কথা শেষ হলনা।

রাজ চীৎকার করল,—না! আমি দীপকে ত্যাগ করতে পারব না। 'দীপ আমার জীবন-দীপ'। ওকে ছাড়া আমার জীবন অন্ধকার দেখবো আমি। ওর জীবনে যে কোন নোংরা অতীত থাকুক না কেন আমি সে সব কিছুকে অগ্রাহ্য করে 'দীপ'কে গ্রহন করবো-ই করবো।

প্রসূন বলল,—সাবাশ রাজ! সাবাশ

॥ ১৯ ॥

দীপান্বিতার সঙ্গে রাজের বিয়ে হল। বাসর ঘরে গিয়ে দীপ মালবিকার ছবিটা দেখিয়ে বলল—জানো রাজ, আমার বিয়েতে সবচেয়ে খুশী হতেন যিনি—ইনি আমার সেই মা।'

রাজ অবাক হয়ে গেল। বলল,—দীপ তুমি কার ছবিকে তোমার মা বলছো?—এ যে এ…যে

—হ্যাঁ, এইতো আমার মা। এ ছবি আগে ড্যাডির ঘরে আলমারিতে ছিল। আজ আমাদের বিয়ে, এইজন্য মায়ের ছবিকে আমি এই ঘরে আনিয়েছি।

—না: রাজেশ চীৎকার করে ওঠে।

—কি হল রাজ?

—না, এ হতে পারে না। ইট কান্টবি! ইম্‌পশিবল! রাজেশ উন্মাদের মতো গলার মালা ছিঁড়তে থাকে?

রাজ তুমি মালা ছিঁড়ছো কেন ?

—মুছে ফেলো দীপ. সিঁদুর মুছে ফেল, তোমার আমার এ সম্পর্ক হতে পারে না।

—রাজ তুমি কি পাগল হলে ?

—হ্যাঁ, হ্যাঁ, ও ছবি আমার মায়ের। দীপ তুমি আমি একই রক্তের ভাই-বোন !

—রাজ, দীপ প্রচণ্ড আর্তনাদ করে উঠলো। দু'জনে ছিটকে দু'পাশে সরে গেলো। যেন একটা বিরাট ঢেউ এসে দুজনকে বিচ্ছিন্ন করে দিল। দীপ কাঁদছে।

—রাজ বলল—মনে আছে দীপ। ড্যাডি একদিন তোমাব জন্ম পরিচয়ের কথা বলছিলেন।

প্রসূন ঠিক সেই সময় ঘরেব মধ্যে প্রবেশ করলো। বলল,—আমি যা বলেছি তা ঠিক। কিন্তু তুমি যে বললে ঐ ছবি তোমার মায়ের—

রাজ জোর দিয়ে বলল—হ্যাঁ, হ্যাঁ ও ছবি আমাব মায়ের। আজ আমার মা আশ্রম চারিনী হলেও ,আমি মাকে চিনতে ভুল করি নি।

প্রসূন রাজের কাছে গিয়ে বলল,—আচ্ছা, তোমার মায়ের নাম কি ?

—মালবিকা, মালবিকা চট্টোরাজ।

—তোমার বাবা ?

—তাকে দেখিনি, শুনেছি চট্টোরাজ পরিবার আমাব মাকে স্বীকার করেনি, তাড়িয়ে দিয়েছে ! সেই সঙ্গে বাবাও নিরুদ্দেশ। মা এখন গোপাল নগর গীর্জাতলার আশ্রমে, কিন্তু আপনি এ ছবি কোথায় পেলেন ? প্রসূন প্রথমে কি উত্তর দেবে ভেবে পায় না। তারপর বলে আমিই তোমার সেই—

—বাবা !

দীপ ছুটে আসে, ড্যাডি !

রাজ আবার প্রশ্ন করে—আপনি যদি আমার বাবা, এই ছবি যদি আমার মা, তা'হলে দীপান্বিতা—?

না, তোমরা ভাই-বোন নও।

দীপ এবার প্রসূনের বুকে আছড়ে পরে, ড্যাডি !

—না দীপ, আমি তোমার ড্যাডি নই, তোমার পিতা হচ্ছেন আমার বন্ধু

সমীর। আর মা হচ্ছেন ইনি—বলতে বলতে সমীর আর নন্দিতার ফটোটা জামার পকেট থেকে বাহির করে দিল। আর নন্দিতার সেই চিঠিটা—

দীপ প্রসূনের হাত থেকে চিঠিটা নিয়ে পড়তে থাকে, পড়া শেষ হলে দীপ আরো কান্নায় ভেঙ্গে পড়ল। এতদিনকার পরিচয়টা যে মিথ্যে, সে যেন ভাবতেই পারে না। প্রসূন রাজেশকে কিছু বলবার জন্য প্রস্তুত হল, কিন্তু সে সুযোগ না দিয়ে রাজ বলল—শুনেছি আপনি স্বইচ্ছায় আমার মাকে বিয়ে করেছিলেন, তাহলে আপনি কেন—

—আমি স্বীকার করি রাজ! কৈফিয়ত চওয়ার অধিকার তোমার আছে। কিন্তু বিশ্বাস করো আমি শুধু একজনের কাছে কৈফিয়ত দেবার জন্য নিজেকে তৈরী করেছি, যার কাছে আমি আজ অনেকখানি অপরাধী। সে হচ্ছে তোমার মা। তোমার মায়ের কাছে… ..

—আচ্ছা রাজ, তোমার মা কোথায় যেন আছে বললে?

—গীর্জাতলার আশ্রমে।

আজ অমাবস্যা!

স্বামী ভৈরবানন্দের আশ্রমে আজ উৎসব, ভক্তরা আশ্রমকে ঢেলে সাজিয়েছে। অনিমেশ বাবু সমস্ত ডেকরেশনের ভার নেন প্রত্যেক অমাবস্যায় (প্রতিবছর)। আলোয় ঝল্‌মল্‌ করছে আশ্রমটা। মন্দিরের ভিতরে মালবিকা পূজায় ব্যস্ত। ভৈরবানন্দ পূজোয় বসবেন, দূর দূরান্ত থেকে বহু ভক্তরা এসেছে যে যার মানত্‌ নিয়ে।

মন্দিরের সামনে ঢাক বাজছে· কাঁসর বাজছে, রোশন চৌকির বাজনা বাজছে। ধূপ-ধূনোর গন্ধে আর আলোর ঝলকানিতে মন্দিরের মধ্যে একটা স্বর্গীয় মনোরম পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে।

এমন সময় একটা ট্যাক্সী এসে আশ্রমের গেটের কাছে দাঁড়াল। ট্যাক্সী থেকে নামল একজন প্রৌঢ়, বয়স পঞ্চাশ-বাহান্ন। পাঞ্জাবী ও পায়জামা পরিধানে একটা পশমের চাদর গায়ে। মাথার চুল ব্যাক-ব্রাশ্‌ করা. কাণের রগের কাছে কিছু পাকা চুল, মুখ ভর্তি দাড়ি গোঁফ, চোখে চশমা।

অনিমেশ বাবুর মুখে খবর শুনে মালবিকা ছুটে এসেছিল. এসে দেখল—প্রসূনকে—কতো পরিবর্তন। মনে মনে বলল—এই কি সেই প্রসূন? মন্দিরের ভেতর থেকে মালবিকাকে আসতে দেখে প্রসূন মনে মনে বলল—কে ও? মন্দির থেকে বেরিয়ে আসছে? গেরুয়া বসন, গলায় রুদ্রাক্ষের

মালা, কপালে বড় গোলাকার সিঁন্দুরের টিপ! এই কি সেই মালবিকা? কত পরিবর্তন?

হাত দু-একের ব্যবধানে দু'জনে স্থাণুর মত দাঁড়িয়ে একে অপরকে অপলক দৃষ্টিতে দেখতে থাকে। মালবিকার ওষ্ঠদ্বয় থর থর করে কাঁপছে। এক সময় প্রসূনই বলে মালবিকা—

মালবিকা যেন জ্ঞান হারায়, আকুল হয়ে প্রসূনের বুকের মধ্যে মুখ লুকিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদে। প্রসূন বলে—

মালবিকা, এ কি তোমার বেশ?

মালবিকা নিজেকে সংবরণ করে বলে,—"যার জীবনের পরম লগ্নে লাল বেনারসী শোভা পাইনি, তার দেহে গেরুয়া পট্টবস্ত্রই যোগ্য বেশ! যার জীবনেয় পরমলগ্নে প্রিয়তমের বরমাল্য শোভা পায়নি, তার গলায় এই রুদ্রাক্ষের মালাই শোভা পায়। কিন্তু তুমি—"

—তোমার অহংকারের কাছে আমার হার হল।

—না, আমারই হার হ'ল। দেখছোনা আমার চোখে জল।

—মালবিকা, ভগবান এই পুরুষ জাতটাকে কাঁদতে শেখায় নি, নইলে দেখতে, আমি তোমার চেয়েও বেশী কাঁদতে পারতাম।

—মালবিকা প্রসঙ্গ এড়াতে বলল,—তোমার মা-বাবা কেমন আছেন?

—খবর রাখিনা।

—অন্যায় করেছ, মা বাবার উপর অভিমান করে খুব অন্যায় করেছ।

—মালবিকা তুমি যদি একটা জিনিষ আমায় দাও, তবে আমি আমার সমস্ত অন্যায়ের প্রায়শ্চিত্ত করতে পারি।

মালবিকা হাসলো. বিষণ্ণ এক টুকরো হাসি ওষ্ঠ প্রান্তে দেখা দিয়ে নিমেষে হারিয়ে গেল, পরিবর্তে একটা বিষাদ ভাব দেখা গেল। তারপর বলল— জীবনের শেষ প্রান্তে এসে আর কি দিতে পারি তোমাকে?

মালবিকা, মালবিকা আমাকে একটা গেরুয়া বসন দিতে পার?

তুমি······মালবিকা বিস্ময়ের সুরে প্রশ্নসূচক দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল।

—প্রসূন বলল, ক্ষত বিক্ষত হয়ে গেছি মালবিকা, মর্ম পীড়ায় আমি একেবারে শেষ হয়ে গেছি। তাই তোমার কাছে একটু শান্তি পেতে চাই। এ থেকে তুমি আমায় বঞ্চিত করো না। মালবিকা কয়েক মুহূর্ত নিঃশব্দ

থাকলো! তখন মন্দিরের মধ্যে পূজা শুরু হয়েছে। স্বামী ভৈরবানন্দের কণ্ঠে মন্ত্রোচ্চারণ শোনা গেল—

ওঁ করালব বদনাং ঘোরাং মুক্ত কেশীং চতুর্ভূজান।
কালিকাং দক্ষিনাং দিব্যাং মুণ্ডমালা বিভূষিতাম্॥

মালবিকা বলল,—পূজা শুরু হয়েছে মন্দিরে চল—

মালবিকার সাথে প্রসূন মন্দির অভিমুখে পা বাড়ালো—

—মা—।

মালবিকা চমকে ফিরে তাকাল, দেখলো আশ্রমের গেটের কাছে একটা ট্যাক্সী থেকে নামছে রাজেশ, বিজন বাবু, রমলা দেবী আর একটি বধূ। মালবিকা দীপাঙ্কিতাকে দেখে অবাক হয় নি, কারন রাজেশ সমস্ত কথা চিঠি মারফৎ জানিয়েছিল, কিন্তু অবাক হয়েছে বিজন বাবু ও রমলাদেবীকে দেখে, অবাক হয়েছিল প্রসূন-ও।

আজ এতগুলো বছর পরে একে অপরের কাছে অপরিচিত আবার চির-পরিচিত, এ সময় বুঝি কারো মুখে ভাষা নেই।

হঠাৎ রাজেশ বলল—এরাঁ তীর্থে বেরিয়েছিলেন, আমি বললাম—চলুন আমার মায়ের আশ্রমে, দেখবেন সবতীর্থের সেরা তীর্থ হয়েছে। রাজের সঙ্গে বিজন বাবুর পরিচয় হয়েছিল ট্রেনের মধ্যে। রাজ আর দীপ আসছিল হাওড়া, আর বিজনবাবু কিছুদিন আগে বেনারসে গিয়েছিলেন বাবা বিশ্বনাথের মন্দিরে, সস্ত্রীক (স্ত্রী-সহ) উঠলেন মোগলসরাই স্টেশনে। আর উঠলেন দীপ রাজের কামরায়, সেখানেই ওদের পরিচয়। জানতে পারে ওরা শুধু সহযাত্রী নয়, ওদের মধ্যে রক্তের সম্পর্ক আছে।

মালবিকা আর প্রসূন দু'জনে এগিয়ে গেল—রমলা দেবী ওদেরকে বুকে জড়িয়ে ধরে কেঁদে ফেললেন। প্রসূন, মালবিকা মা-বাবার পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করলো। রমলাদেবী বললেন,—"বৌ মা তোমাকে তো বরণ করে আমাদের চট্টোরাজ পরিবারে গ্রহণ করতে পারেনি। তাই বলছি আমাদের এই নাত্‌বৌকে তুমি বরণ করে ঘরে তুলবে চলো—"

– মা; মালবিকা অনেক কষ্টে নিজেকে সামলে নিয়ে বললো,—"না, মা। আপনাদের জিনিষ আপনারা যেমন খুশি করে গ্রহণ করুন, দয়া করে আমাকে তার মধ্যে জড়াবেন না।"

—বৌমা!

মালবিকা বলে চলে—'তবে যাবার আগে চরণামৃত নিয়ে যাবেন, আসুন পূজা শেষ হয়ে এল'। ওরা সকলেই মন্দির অভিমুখে চললো— তখন সন্ধ্যারাত্রি চলছে।

রোশন চৌকির বাজনা বাজছে। আর ভৈরবানন্দের গুরু গম্ভীর কণ্ঠস্বর শোনা যাচ্ছে! ওঁ-শান্তি! ওঁ-শান্তি! ওঁ শান্তি!

'পাপ-পুণ্য'

আমি আপনাদের সামনে যে কাহিনী পরিবেশন করতে চলেছি—তা ভালো লাগলে পরিশ্রম সার্থক হয়েছে বলে মনে করবো!

কাহিনীর ঘটনা—"কাশী"—সময়কাল: সাত বছর পূর্বে, ঘটনার বিবরণ নিম্নরূপ: কাশী শহর হইতে পাঁচ কি. মি ভেতরে প্রবেশ করিলে দেখিতে পাওয়া যায়—বিশ্বনাথ মন্দির ব্যতীত বেশ কিছু ছোট্ট/মাঝারি মন্দির—তীর্থস্থান কেন্দ্র এই কাশী সকলের জন্য।

কাশী শহরে বৃন্দাবন গোঁসাইকে চেনে না এমন ব্যক্তি খুব কমই আছে। 'গোঁসাই' নামে কাশীতে পরিচিত। অবশ্য সকলেই বড় গোসাঁই বলে ডাকে। এমন কাজ নেই সে পারে না—এককথায় 'জুতো সেলাই হতে চণ্ডীপাঠ'—সকল কাজেই পারদর্শী—বয়স ষাটের ওপর হলেও তাঁর স্বাস্থ্য অটুট রয়েছে। স্ত্রী গীতাদেবীর বয়স একান্ন হলেও যৌবন তাঁকে বার্ধক্যের কোটায় নিয়ে যেতে পারেনি। তাদের একমাত্র কন্যা 'কামনা' রূপে গুনে, অতুলনীয়া।—সতেরো বছরের যৌবনবতী সুন্দরীকে সকলেই বেশ সু-চক্ষে দেখত। অনন্তা যৌবনা-চঞ্চলা হরিনী ন্যায় যুবতী নাচ-গান পড়াশুনা এবং গৃহকর্মে নিপুনা—এককথায় সকলের মন জয় করে ফেলেছে।

বৃন্দাবন গোঁসাই (বড় গোঁসাই) যৌবনে গীতাদেবীকে ভালবেসে বিবাহ করেছিলেন। যৌবনে গীতাদেবী'ও অপরূপা সুন্দরী ছিলেন।

এই 'কাশী' শহরে এক আয়েঙ্গার ব্রাহ্মণ স্ত্রী নিয়ে বসবাস করছেন বহুবছর ধরে। শ্রীমন্ত চক্রবর্ত্তী (ব্রাহ্মণ) জমিদার ছিলেন-স্ত্রী পদ্মাদেবী এবং একমাত্র একুশ বছরের পুত্র 'কার্ত্তিক'কে নিয়ে সুখের সংসার ছিল।

শ্রীমন্ত চক্রবর্ত্তী'র পুত্র 'কার্ত্তিক' সুদর্শন যুবক। পড়াশুনা শেষ করে জমিদার বংশের কাজপত্তর দেখাশুনা করছে। পিতা শ্রীমন্ত চক্রবর্ত্তীকে সাহায্য করে।

এদিকে বৃন্দাবন গোঁসাই'র কন্যা 'কামনা' বয়স আস্তে আস্তে বাড়তে থাকে—বেশকিছু শহরের ব্যক্তি (কাশী'র) বড় গোঁসাইকে বলেন—কন্যার

বিয়ে দিয়ে দিন—পাত্র বহু পাবেন-আপনার কন্যা তো 'রূপে লক্ষ্মী গুনে সরস্বতী'।

বড় গোঁসাই বললেন—আরে, এই তো বয়েস, এরই মধ্যে তোমরা আমার একটি মাত্র কন্যাকে আমার নিকট থেকে ছিনিয়ে (আলাদা) নিতে চাও?

সকলে চুপ করে গিয়েছিল বড় গোঁসাই'র কথা শোনার পর। কেহ আর কোনদিন ভুলেও বড় গোঁসাই'র নিকট বিবাহের প্রস্তাব নিয়ে হাজির হবার মত দুঃসাহস দেখায় নি। 'কামনা' কিন্তু সব পুরুষমানুষদের এড়িয়ে চলত—সে বুঝেছিল পুরুষ মাত্রই লোভী, ভোগী, স্বার্থপর এবং কাপুরুষ। তারা চায় নিজের বাসনা চরিতার্থ করতে—কামনা ঠিক করলো জীবনে যদি সত্যি সত্যিই তেমন কোন 'পুরুষসিংহ' সে পায় তবেই বিবাহ করবে—নতুবা সে 'চিরকুমারী' থাকবে।

শ্রীমন্ত চক্রবর্ত্তীর পুত্র 'কার্ত্তিক' যুবতীদের দেখলেই কেমন যেন আড়ষ্ট হয়ে যেত। কোন কন্যা কথা বলতে এলেই সে সঙ্কোচে মাথা নীঁচু করে সে স্থান ত্যাগ করত। —চলে যেত। কন্যারা হো-হো শব্দে হাসতো-তাকে রাস্তা দিয়ে যেতে দেখলে। কার্ত্তিক ভাবল—কি রে বাবা! লজ্জা সরম বলে কিছু নেই—কন্যাদের প্রতি বিতৃষ্ণা;—পরিস্কার ভাবে পিতাকে জানিয়ে দিয়েছিল যে—সে জীবনে বিবাহ করবে না। তার পিতা অনেকবার তাকে বুঝিয়ে ছিল—বংশরক্ষার স্বার্থে বিবাহের প্রয়োজন। জমিদার বংশের মান-সম্মান বিসর্জন কিছুতেই ধূলোয় মিশিয়ে দেবেন না। তিনি পুত্র কার্ত্তিকের বিবাহ দেবেন।

এদিকে কাশীর বড় গোঁসাই'র বাড়ীর আশেপাশের বেশকিছু ব্যক্তিরা ক্রোধে উন্মত্ত হয়ে গিয়েছিল—তাঁর কথা শুনে এবং কন্যা কামনা'র জোর করে বিবাহ দেবার জন্য গুপ্তভাবে তারাসকলে মিলে শলা পরামর্শ চালিয়ে যেতে থাকে।

একদিন তারা দারুন একটি প্ল্যান আঁটল নিজেদের মধ্যেই। বাইরের কেহই একথা জানতে পারল না—খুব সিক্রেট ব্যাপার। সকলে মিলে সাহসের সঙ্গে বুক বেঁধে বড় গোঁসাই'র বাড়ী অভিমুখে চলল—গন্তব্যস্থলে পৌঁছে তারা দেখল—দরজায় তালা ঝুলছে। ঘরের জানালা দরজা সমস্ত বন্ধ। সকলেই বুঝতে পারল বড় গোঁসাই স-পরিবারে তীর্থ করতে গেছে—খোঁজ নিয়ে জানল—হরিদ্বারে তীর্থে গেছেন।

সকলেই প্ল্যান করে—দু'জন গুণ্ডাশ্রেণীর লোককে হাত করে হরিদ্বার পাঠালো। উদ্দেশ্য 'কিডন্যাপ' করে বড় গোঁসাই'র কন্যা কামনা'কে বন্দী রাখবে একটি নির্জন স্থানে—কথামতো দু'জন গুণ্ডা তন্নতন্ন করে হরিদ্বারে 'কামনা'কে খুঁজতে থাকে। এক সময় তারা দেখতে পায়—একটি মিষ্টির দোকানে বড় গোঁসাই, স্ত্রীও কন্যাসহ জলযোগ করছে। জলযোগ শেষে বড় গোঁসাই স্ত্রী কন্যাকে বসতে বলে কোথায় যেন গেলেন। গুণ্ডাদ্বয় বুঝল— এই সুযোগ হাতছাড়া করা মানেই বোকামি—দোকানে প্রবেশ করে স্ত্রীকে একটি চিরকুট দিযে বলল—'বড় বিপদ! আপনি শীঘ্রই কন্যা সমেত বড় গোঁসাই'র (আপনাব স্বামীর) পিছু পিছু ফলো করুন—আপনি কেনও বুঝতে পারছেন না—উনি হরিদ্বার থেকে হেঁটে ষ্টেশনের দিকে চলেছেন—

আপনাকে কি বলেছে জানিনা কিন্তু আসলে আপনাদের ছেড়ে কাশীতে চলে যাচ্ছেন—এটাও বুঝতে পারছেন না ?

বড় গোঁসাই'র স্ত্রী গীতাদেবী বললেন,—প্রমান দিতে পারেন? কোন কিছু প্রমাণ কি ? দু'জন গুণ্ডার একজন বলল—বেশ প্রমাণ চান তো দিতে পারি—আসুন গীতাদেবীর হাত ধরে দোকানের বাইরে টেনে এনে কথা বলার সুযোগ না দিয়েই নাকের সামনে রুমাল ধরলো—মিষ্টি গন্ধে গীতাদেবী কেমন যেন হয়ে গেলেন। একটি গুণ্ডা গীতাদেবীকে ধরাধরি করে টাঙ্গা গাড়ীতে উঠিয়ে দিয়ে সহিসকে বললেন—"আমার মাকে বাঙ্গুর ধর্মশালায় পৌঁছে দাও—এই নাও কুড়ি টাকা—দেখো যেন কোন কষ্ট না হয়। টাঙ্গাওলা কিছু না বলে স্টার্ট করে গীতাদেবীকে নিয়ে সে স্থান ত্যাগ করে টাঙ্গা ছুটিয়ে চলল।

অপর গুণ্ডাটি তখন 'কামনা'কে উল্টো বুঝিয়ে দিল। বলল দেখলে লোকটা কি শয়তান—তোমার মাকে পাঠিয়ে দিল—নিজের মনস্কামনা চরিতার্থ করার জন্য। যদি তোমার মাকে খুঁজে পেতে চাও তো তাড়াতাড়ি আমার সঙ্গে চল—ঘোড়ার গাড়ী প্রস্তুত। খুঁজে বের করবোই—তোমার মা— আমারও মা।

'কামনা' কেমন যেন বিশ্বাস করে বলল—ঠিক আছে, শীঘ্র চলুন।

গুণ্ডাটি 'কামনা'র সঙ্গে ঘোড়াগাড়িতে উঠেই বলল—'কালিকাপুর জঙ্গল'। কামনা বলে উঠে—কি বললেন? ওখানে কেন নিয়ে যাচ্ছেন ?

গুণ্ডাটি ততক্ষণে মিষ্টি রুমালের গন্ধে কেমন যেন করে ফেলে 'কামনা'কে।

কামনার কিছু মনে পড়ে না। কেমন যেন হয়ে যায়। সে চুপচাপ লোকটির কাঁধে নিজের মাথা রেখে ফ্যাল্ ফ্যাল্ দৃষ্টিতে চেয়ে থাকে।

অবশেষে 'কালিকাপুর' জঙ্গলে এসে পৌঁছয়। নেমে দেখে অপরগুণ্ডাটি সাইকেলে চেপে ফুল স্পীডে তাদের দিকে আসছে। এক সময় গুণ্ডাটি এসে পড়ে—বলে 'ওস্তাদ সব ঠিক হ্যায়'। —সাব্বাস্।

দু'জনে কামনা কে ধরাধরি করে জঙ্গলের মধ্য দিয়ে জীর্ণ পোড়ো মন্দিরের মধ্যে নিয়ে আসে।

এদিকে বড়গোঁসাই পাঁচ/ছ মিনিট বাদে মিষ্টির দোকানে এসে দেখে স্ত্রী-কন্যা নেই। দোকানদারকে জিজ্ঞাসা করলে—বলে জানিনা। তন্নতন্ন করে খুঁজতে থাকে। অবশেষে ধর্মশালায় অচৈতন্য অবস্থায় স্ত্রীকে পায়—জল ছিটিয়ে জ্ঞান ফিরিয়ে জিজ্ঞাসা করে 'কামনা' কোথায়? স্ত্রী কিছুই বলতে পারে না—বলে জানিনা'। বড়গোঁসাই'র মন ভেঙ্গে যায় বহু খোঁজাখুঁজি করেও একমাত্র কন্যা 'কামনা'কে হারিয়ে পুনরায় কাশীতে ফিরে আসে।

এদিকে গুণ্ডাদ্বয় মন্দিরের গুহায় প্রবেশ করে সুড়ঙ্গের মধ্য দিয়া লইয়া আসে 'কামনা'কে একটি ঘরের মধ্যে—শয্যার ওপর শুয়ে দেয়—কামনা তখনও ঠিক বুঝতে পারছেনা তাকে হিপাটানোডাইজ করার জন্য কিছু বুঝতে পারে না। গুণ্ডাদুটি বিছানায় শুইয়ে 'কামনা'র পরিধানের সমস্ত বস্ত্র খুলে বিবস্ত্রা করে ফেলে। একটি সুতোও তার দেহে নেই সম্পূর্ণ বিবস্ত্রা যুবতী—অপূর্ব সুঠাম দেহ, উন্নত পর্ব্বতের ন্যায় বুকদ্বয়, ভারি নিতম্ব—মনে হচ্ছে খোদাই করা একটি জীবন্ত মুর্ত্তি! ঈশ্বরের বিস্ময়কর সৃষ্টি। গুণ্ডাদ্বয় একে একে ওই অবস্থায় নিজেদের মনস্কামনা চরিতার্থ করে কামনার সুঠাম দেহের ওপর। তারপর একটি মাত্র ওড়না তার শরীরে রেখে (বাকী শাড়ী, ব্লাউজ—এবং —সায়া নিয়ে নেয়) দু'জনে ঘরে তালা বন্ধ করে সুড়ঙ্গের মধ্য দিয়ে মন্দিরের ওপরে উঠে আসে এবং সে স্থান ত্যাগ করে কাশীতে এক সময় ফিরে আসে।

এই গুণ্ডাদ্বয়ের দুনম্বর কাজ—ব্রাহ্মণ জমিদার শ্রীমন্ত চক্রবর্ত্তীর একমাত্র পুত্র 'কার্ত্তিক'কে ভুলিয়ে নিয়ে 'কালিকাপুর জঙ্গলে' কামনার কাছে রেখে দেওয়া। যাইহোক্ কথামতো কাজ করে জহর ঘোষ সহ দু'জন গুণ্ডা—কালিকাপুর জঙ্গলে কার্ত্তিককে সংজ্ঞাহীন অবস্থায় নিয়ে আসে এবং একসময় সুড়ঙ্গের ভিতর প্রবেশ করে 'কামনা'র শয্যার পাশে কার্ত্তিককে শুইয়ে দেওয়া

হয়। পরনের সমস্ত কিছু খুলে নিয়ে দরজায় তালা লাগিয়ে দু'জন গুণ্ডাসমেত জহর ঘোষ সে স্থান ত্যাগ করে কাশীতে ফিরে আসে।

কাশীবাসীর সেই সব লোকেরা নিজেদের মধ্যে বলাবলি করতে থাকে—এবার বড় গোঁসাই'র টনক নড়বে তাঁর দর্প চুর্ণ হবে-ই দাম্ভিকতা থাকবে না।

বড় গোঁসাই ও স্ত্রী গীতা দেবী কান্নায় প্রথমে ভেঙ্গে পড়লেও পরে নিজেদের সামলে নেন—দু'জনে ভাবেন কন্যা 'কামনা' কে আর ফিরে পাবেন কি ?

এদিকে 'কালিকাপুব জঙ্গলে'র গুপ্ত সুড়ঙ্গের সেই ঘরের মধ্যে এক সময়ে কার্ত্তিকেব জ্ঞান ফিবে আসে—একবার চোখ মেলে দেখে যে—সম্পূর্ণ বিবস্ত্রা হয়ে একটি অপরূপা সুন্দরী কন্যা ঘুমে নিমগ্ন—ভয়ে সঙ্কোচে কন্যাকে দেখেই সঙ্গে সঙ্গে চোখ দুটি বন্ধ করে ফেলে, হয়তো বা সে ভুল দেখলো—কিংবা খোয়াব এর খোয়াড়ি অর্থাৎ স্বপ্ন দেখছে না তো ? চোখ বন্ধ করেই হাতটা আস্তে আস্তে চালিয়ে অনুভব কবতে থাকে—সত্যিই কোন রক্ত মাংসের কন্যা তার পাশেই শুয়ে আছে কিনা ? না ভুল করেনি সে। এই তো মাখনের মতো কি নবম তার দেহ, প্রানভরে জোরে শ্বাস টানলো সে।

আঃ কি সুন্দর খুশবু ! কন্যাটির দেহ থেকে সুগন্ধ ছড়িয়ে পড়ছিল ঘরময়—এবার সে মাথা তুলে চোখ মেলে দে'খ—তার পাশে এক অচেনা অজানা অপরূপা বিবস্ত্রা সুন্দরী—নিরাবরণ মগ্ন নিরুপম রূপের দিকে তাকিয়ে এক অভুতপূর্ব অনাস্বাদিত পুলকে কার্ত্তিকের দেহমণ শিহরিত হয়ে উঠতে থাকে, চাঁদের মতো ফুটফুটে সুন্দরীর নিরাবরণ দেহটার দিকে মুগ্ধ নয়নে সে চেয়ে থাকে, এত রূপ সে পূর্বে কখনও দেখেনি—তার দেহ মনে এক অজানা শিহরণ জাগে, দেখতে থাকে—ঈশ্বরের এই অতুলনীয় সৃষ্টির কথা স্মরণ করে মাথা নত হয়ে আসে, কপালে মুখটা নামিয়ে আলতোভাবে চুম্বন করে কার্তিক। তার মনে হয় এতরূপ কোন যুবতী কন্যার হতে পারে ? আঙ্গুরের মতো দুটি ঠোঁট, মরালের মত গ্রীবা, সুডৌল পর্ব্বতের ন্যায় স্তনদ্বয়, ক্ষীণ কটি, ভারি নিতম্ব—নিরাসক্ত পুরুষের বুকেও ঝড় তুলতে বাধ্য। কার্তিক দেখলো—শেমিজ/ওড়নাটি পাশে বিছানার ওপর রয়েছে, আস্তে আস্তে ফিনফিনে পাতলা শেমিজটি তার দেহে ঢাকা দিল, কিন্তু না! কিছুতেই যৌবনের জোয়াড়ে কন্যাটির দেহ ঢাকা যাচ্ছে না। তার উন্মুক্ত দেহ-বুকদ্বয় উঠানামা করছে—কাঁচের ন্যায় ওড়নাটির নীচে ধবধবে ফর্সা দেহখানা আয়নার মতো পরিস্কার দেখা যাচ্ছে, এক সময় ওড়নাটি

কন্যার দেহ থেকে পাশে বিছানার উপর পড়ল—কার্ত্তিক বিস্ময়ে দেখতে থাকে কন্যাটির সারা শরীর জুড়ে 'কামের' ছাপ প্রকাশ পাচ্ছে-দেহ উন্নত বুকদ্বয় এবং তার নীচে ভারি নিতম্ব—ওঃ কার্ত্তিক নিজেকে সংযত করার চেষ্টা করছে কিন্তু বাঁধভাঙ্গা যৌবনকে ঠেকিয়ে রাখবে অতো শক্তি তার নেই। কার্ত্তিক তার হাতখানা নামিয়ে রাখতে গিয়ে রাখলো কন্যাটির কবোষ্ণ উরুর খাঁজে। তারপর শুয়ে রইল বিবস্ত্রা কন্যাটির পাশে—মনে হচ্ছিল 'এ দৃশ্য দেখা পাপ' কিন্তু নিজেকে সংযত রাখতে পারছে না। তেরছা চোখে চুরিয়ে চুরিয়ে তার সারা শরীর খুঁটিয়ে পর্যবেক্ষণ করতে লাগল। যতই দেখে ততই মুগ্ধ নয়নে···আঃ দারুণ! দেহের প্রতিটি অঙ্গপ্রত্যঙ্গ যেন সনিপুণ শিল্পীর হাতে গড়া সুঠাম সুন্দর এক শিল্প মূর্তি। উত্তেজনায় সারা শরীর ঘেমে ওঠে। কন্যাটির মাথা থেকে পা পর্য্যন্ত হাত বুলাতে থাকে সে চরম আনন্দে। কি যে ভাল লাগে তার কি করে বোঝাবে সে কথা। এ আনন্দ শুধু অনুভবের—প্রকাশের নয়। কার্ত্তিকের জীবনে এ অভিজ্ঞতা এই প্রথম। তার দেহে যৌবনের জোয়ার আসে –এই মুহূর্তে বুঝি সকল বাধা ছাপিয়ে সে উপচে পড়তে চায়—মনে হয় সংযত-সংহত থাকার সব বাঁধই উৎঘাত হয়ে যাবে। তাই আর দেরি করেনা—দেহ যা চায়, মনও যখন তাই চায়, তাতে আর বাধা দিতে নেই। কার্ত্তিক হাত বুলাতে থাকে ওর গালে, ঠোঁটে, ওর গ্রীবা ঘাড়ে বুকে স্তনদ্বয়ে-বৃন্তে ····কন্যাটির বুকের সঙ্গে মুখ ঘষতে থাকে—চাঁপাকলির মতো স্তনাধার ঠোঁটের ঘর্ষনেই পলকেই রক্তাভ হয়ে ওঠে। কিন্তু এতকিছু করার পরও কার্তিক আশ্চর্য হয়ে যায়—দেখে কন্যাটি তখনও ঘুমের নেশায় মগ্ন। কার্ত্তিক বৃথা চেষ্টা করে তার ঘুম ভাঙ্গনোর। যতই তাবে নিয়ে নাড়াচাড়া করতে থাকে ততই সে কামনায় উত্তেজিত হয়ে ওঠে। কন্যাটির অধরে অধর রাখে—দীর্ঘ চুম্বনে চুষতে থাকে—কিন্তু তবুও কোনো সাড়া নেই—পরপর চুম্বনে চুম্বনে ঠোঁটে রক্ত ঝরিয়ে দেয়। কার্তিক আপন মনে বলে চলে—"আমি বড় তৃষ্ণার্ত সুন্দরী, আমি আর নিজেকে ধরে রাখতে পারছি না—আমাকে স্বইচ্ছায় সুধা পান করাবে? কিন্তু তুমি ঘুমে বিভোর—আমি তোমার ঘুম ভাঙ্গাতে পারলাম না, এদিকে যৌবন জ্বরে জর্জরিত আমি। কামবানে বিদ্ধ এক তৃষ্ণার্ত কপোত। আর তুমি সেই মদালসা নারী ঘুমে অচৈতন্য, ক্ষমা করো আমায়, সাধ্য নেই ধৈর্য ধরি। তাই চুরি করে নিতে হল—তোমার সদ্য ফোটা যৌবনের প্রথম কদম ফুল।"

হঠাৎ কার্তিকের বিবেক দংশন করল। সে তার বংশ মর্য্যাদার কথা চিন্তা করল। সে জমিদার শ্রীকান্ত চক্রবর্ত্তীর একমাত্র ছেলে। দেশে সৎ ও চরিত্রবান বলে তার যথেষ্ট খ্যাতি আছে। সে কি করে কামান্ধ হয়ে এক অজানা যুবতীর সাথে সহবাস করবে। সে মনে মনে ভগবানকে স্মরণ করল। হে ভগবান আমাকে তুমি শক্তি দাও—আমি যেন কোন পাপকার্য্যে লিপ্ত না হই। আমাকে তুমি রক্ষা কর।

আমার এই পবিত্র দেহ কোন পাপ স্পর্শ করতে না পারে। আমি চিরকুমার ও চির ব্রহ্মচারী। আমি জানি না কি করে আমি এখানে এলাম। কি করে আমি এই নারীর পাশে শায়িত হলাম। আমি জানি আমার শক্তি খুবই কম। আমি এই অবস্থায় নিজেকে সংযত রাখতে পারব না। যদি তুমি আমাকে শক্তি না দেও। হে ভগবান! আমি কোনদিন কোন পাপকার্য্য করি নাই। তুমি আমাকে এই কুহকিনী মায়াবীর হাত থেকে রক্ষা কর। এই বলে কার্ত্তিক আকুল হয়ে ভগবানের কাছে তার আকুতি জানাতে লাগল।

হে ভগবান আমি তোমার কাছে আবার প্রার্থনা করি যে আমি যেন এই নারীকে আমার বৈধ স্ত্রী রূপে গ্রহণ করে সুখে বাস করিতে পারি এবং আমাকে যেন পাপের ভিতরে যেতে না হয়।

সে আরও ভাবল কি ব্যাপার—তার পিতা চক্রান্ত করে এখানে বন্দী করে রাখেনি তো বিবস্ত্রা যুবতী (কন্যার) সামনে? কারণ তার মনে পড়ল—সে পিতাকে বলেছিল—জীবনে সে বিবাহ করবে না। নিশ্চয় পিতা বুদ্ধিমানের মত বিবস্ত্রা নারীর পাশে তাকে শুইয়ে দিয়ে (মনে মনে) মজা লুটছে—এ সব তার পিতার কারসাজী ছাড়া কিছুই নহে। এক লাফে সে বিছানা থেকে নামতে চেষ্টা করল—কিন্তু না, হঠাৎ তার মাথা প্রচণ্ড ঘুরতে লাগল—গা গুলিয়ে হঠাৎ অচৈতন্য হয়ে বিছানার মধ্যেই চিৎ হয়ে পড়ে গেল কন্যা (যুবতী)টির পাশে বুকের ওপর।

হঠাৎই কন্যাটির ঘুম ছুটে গেল—সে চমকে নিজে লজ্জায় একটু পাশে সরে গেল— এ কি? নিজের চোখকে নিজেই সে (কামনা) বিশ্বাস করতে পারে না। বিস্ময়ে চোখ বড় বড় হয়ে ওঠে দু'হাত দিয়ে চোখদ্বয় রগড়ে নেয়, সে কি স্বপ্ন দেখছে? কিন্তু না, স্বপ্ন তো নয়! তন্ময় হয়ে চেয়ে চেয়ে দেখতে থাকে সে

যুবকটির নগ্ন দেহ—বাঃ কি সুন্দর, এত রূপ কখনও পুরুষ মানুষের হয়। কিন্তু 'কামনা' চিন্তা করতে থাকে সে এল কি করে? সে মনে মনে ভাবে এমন সুন্দর সুপুরুষ আছে জানলে সে পূর্বেই পিতার মত নিয়ে বিবাহ করত—এমন যুবক পেলে কি কোনও যুবতী নিজেকে ঠিক রাখতে পারে?

ক্রমশঃ উত্তেজনায় নিজেকে সে সংযত করার চেষ্টা করতে থাকে—কিন্তু সে পারে না। সে যুবকটির অতি নিকটে সরে আসে। যতই দেখতে থাকে সে বিহ্বল ও আনন্দে আত্মহারা হয়ে পড়ে। মুখখানা নামিয়ে এনে যুবকটির ওষ্ঠে চুম্বন করে। যুবকটির একখানা হাত তুলে নিজের ঠোঁটে চুম্বনে অস্থির করে তোলে। ফিস্ ফিস্ · · · · …বুকের মধ্যে উথাল-পাথাল করছে, ওগো, আমি আর নিজেকে সংযত করতে পারছি না।

তবুও নিজেকে সংযত করার আপ্রাণ চেষ্টা করতে থাকে। পূর্বের স্মৃতি মনে করার চেষ্টা করতে থাকে যাতে দেহ উত্তেজিত না হয়—উত্তেজনা বৃদ্ধি না পায়। মনে পড়ে যায় সে-বার এক বান্ধবী'র সঙ্গে গার্ডেনে বেড়াতে গিয়েছিল। দু'জনে এক জায়গায় বসে ঝালমুড়ি আলুকাবলি খাচ্ছিল। হঠাৎ একটি যুবক এসে বলে—Empty or Engaged—দুজনে যুবকটির দিকে তাকিয়ে দেখে। কামনা চোখ নামিয়ে নেয়। তার বান্ধবী কৃষ্ণা বলে ওঠে—তাতে আপনার কি দরকার। Don't disturb. Please go your way. তবুও যুবকটি দাঁড়িয়ে থাকে। বলে ম্যাডাম উত্তরটি পেলেই চলে যেতাম—যেহেতু পেলাম না তবে ধরে নিতে হচ্ছে Vacancy আছে—কি বলেন? বলেই হো-হো শব্দে হেসে ওঠে। কৃষ্ণা প্রচণ্ড রেগে যায় বলে আপনার নির্লজ্জের মত হাসতে সংকোচ হচ্ছে না। চল্ কামনা—একটু যদি শান্তিতে কোথাও দু'দণ্ড বসতে পারি—যতো সব উটকো ঝামেলা—নাঃ ভাল লাগে না। যুবকটি বলে যে—না আপনারা উঠবেন কেন? আপনারা বসুন—আমি চলি Disturb করার জন্য আন্তরিক দুঃখিত।

এই কথা বলে যুবকটি যেতে উদ্যত হলে কামনা বলে—শুনুন! কৃষ্ণা অবাক বিস্ময়ে কামনার দিকে তাকায়। তোর আবার কি হল? ডাকার কি আছে! কি যে করিস না কিছু বুঝতে পারছি না। যুবকটি ইতিমধ্যে এগিয়ে এসে বলে আমাকে কিছু বলবেন? —হ্যাঁ কিছু বলব বলেই ডাকলাম —কামনা বলে। —বলুন কি ব্যাপার! —বসুন, বলছি। একসময় যুবকটি

ছুঁগত ব্যাবধানে বসে পড়ে। কামনা বলে আরও তো কত সুন্দরী যুবতী রয়েছে হঠাৎ তাদের ছেড়ে আমাদের যে বিরক্ত করছেন কি ব্যাপার—জানতে পারি কি?

দেখুন হঠাৎ প্রথম দর্শনেই প্রেমে পড়ে গেছি—Love at first sight তাই হয়ত বা আপনাদের পেছনে পড়েছি—অন্য কিছু ভাববেন না যেন,—বাঃ বাঃ কি এমন দেখলেন যে প্রেমে পড়ে গেলেন? কি আছে আমাদের? আমরা তো কিছু বুঝে উঠতে পারছি না? —অনেক কিছুই আছে আপনাদের বাড়ীতে গিয়ে কোনদিন আয়নার সামনে ভালভাবে নিজেদের লক্ষ্য করেছেন—লক্ষ্য করলে আপনাদের সব প্রশ্নের উত্তর পেয়ে যেতেন।

—জানা রইল। আর কি জানতে চান চটপট বলে ফেলুন।

—কোথায় থাকেন তার ঠিকানা জানাতে আপত্তি আছে?

—ঠিকানা নাই-বা জানলেন—তাতে লাভ কি?

—লাভ ক্ষতি ভেবে কথাটা বলিনি—এমনি মনে হল তাই .....

—ঠিকানা না জেনে ভালই করেছ বন্ধু বলে ওঠে।

কৃষ্ণা—কি হবে শুধু শুধু সুস্থ শরীরকে অসুস্থ করে—কোনো মানে হয়। তাইতো বলি Bye

—এর মধ্যেই Bye করে আমায় চলে যেতে বলছেন!

এটা কি ঠিক করছেন? ভুল করছেন ভাবুন একবার।

—আর ভেবে কাজ নেই, কি হবে? চিন্তা করে লাভ?

—আবার সেই লাভ-ক্ষতি টেনে এনে ব্যাপারটাকে বেশ জটিল করে তুলতে চাইছেন। লাভ-ক্ষতির গুলি মারুন। লাভ-ক্ষতি হিসেব করে জীবনে কখনো চলিনি ভবিষ্যতেও চলতে চাই না।

—আপনার না হয় লাভ-ক্ষতি চিন্তা না করে চললেও অনেক সময় ঠিক আছে। কিন্তু আমরা অর্থাৎ যুবতীরা। আমাদের তো ঐ সব জিনিষ ভাল ভাবে চিন্তা করে তবে Step by Step পা ফেলে ধীরে ধীরে এগোতে হয়, ঠিক কিনা বলুন?

—না তা অবশ্য ঠিকই।

—বেঠিক বলি কি করে? ভেবে-চিন্তে তবে না বললাম। তাহলে

রোমিও'র মত যুবতী কন্যাদের পিছু পিছু ঘোরা হয়? এ্যাম আই রং .....
কিছু ভুল বললাম কি?

—না তা নয়—এসেছিলাম এক বন্ধুর বাড়ীতে বন্ধু বাড়ী নেই। মাসিমা বলল বাবা তুমি দেড়-দুঘণ্টা পরে এস, ওকে আমি একটা জরুরী কাজে এক জায়গায় পাঠিয়েছি। তাই কি করব। সময় তো কাটাতে হবে তাই মনে করলাম সময় কাটানোর বেষ্ট জায়গা—তাই চলে এলাম। কিছু কি ভুল করেছি ম্যাডাম!

—না ভুল কখনো আপনি করতে পারেন? যতো ভুল তো আমরাই করি—মানে যুবতীরা ভ্রমরের মোহে নিজেদের সঁপে দি-ই—সব কিছু দেওয়ার পর ভ্রমরের কাজ সেই ফুল ফেলে উড়ে অন্য ফুলে গিয়ে বসা—এক ফুলে সন্তুষ্ট নয়। তারা উড়ে উড়ে ডানা মেলে ফুলে ফুলে মধু খেয়ে বেড়ায়। এইভাবে ভ্রমরাদের বাসি করে হাসিমুখে কেটে পরে। তা'হলে ভ্রমররা fool কি বলেন? ভ্রমর সমস্তর কর্ম ফুলের মধু উপভোগ করে ফুলটির নির্যাস শুষে নেয়। তারপর বাসি হলে পর কেটে পড়ে—কতো নিষ্ঠুর বলুন তো ঠিক কি-না? যুবকটি চলি বলে, চলে যায়।

কামনা'র অতীতের আরও একটি স্মরণীয় ঘটনা মনে পড়ে—তাঁর মন ফিরে যায় দু'বছর পূর্বে। একবার মাসতুতো দাদা শুভদা'র বিয়ের জন্য পাত্রী দেখার ঘটনা—কামনা এবং মাসী এবং মেশোমশাই সকলেমিলে শুভ'র জন্য পাত্রী দেখতে যায়।

পাত্রী'র বাড়ী সকলে এসে উপস্থিত। হবু পুত্রবধুকে দেখে শুভদা'র মা-বাবা ভীষণ খুশী। কিন্তু কামনা একটু বাজিয়ে নিতে চায় তার হবু বৌদিকে। হবু বৌদির নাম রমালি-'রমা' ডাক নাম। কামনা ইঙ্গিতে রমাকে কাছে আসতে বলে—কাছে আসতেই বলে—যদি কিছু মনে না করেন তো একটি কথা বলছি। মুখ কানে এনে একটি কথা বলেই বলে—কি, রাজী আছেন তো? রমা লজ্জায় রাঙা হয়ে যায়—বলে আচ্ছা ঠিক আছে। চলুন পাশের ঘরে—বলেই দু'জনে চলে যায়। কামনা ও রমা পাশের ঘরে প্রবেশ করে ভালভাবে দরজা-জানালা বন্ধ করে আলো জেলে দেয়, কামনা বলে—তুমি বলেই বলছি কিছু মনে করবেন না।

রমা: আরে ঠিক আছে—তুমি বলুন।

কামনা—তোমাকে ওপর থেকে দেখতে সত্যিই সুন্দরী মুখশ্রী সুশ্রী, স্বাস্থ্য ভালই-কিন্তু ভেতরে কি খুঁত আছে সেটা তো বুঝতে পারছি না। এজন্যই এই ঘরে আনা আর কি! নাও তাড়াতাড়ি কর। তোমাকে সম্পূর্ণ বিবস্ত্রা অবস্থায় দেখব-একটি মেয়ের সামনে বিবস্ত্রা হতে আপত্তি কি? রমার মুখ লজ্জায় লাল হয়ে গেল। সে ইতঃস্তত ভাবে বলল না···মানে···ইয়ে···ঠিক·

কামনা: আমি তো তোমাকে পুরুষের সামনে কিছু এখনই করতে বলছিনা —রাজীহয়ে বিবস্ত্রা হও। এই বলেই রমা'র শাড়ী খুলে দিতে থাকে। শাড়ী খোলার পর একপাশে ফেলে দিয়ে ব্লাউজ খুলে ব্রা খুলে বুকদ্বয় সম্পূর্ণ উন্মুক্ত করে দেয়। এরপর হাত চলে আসে সায়ার দড়িতে, টান মেরে নামিয়ে সম্পূর্ণ নিরাভরন করে দেয়। লজ্জায় রমা চোখ বন্ধ করে দাঁড়িয়ে থাকে। কামনা দেখতে থাকে গায়ের রং দুধে আলতা, স্তনদ্বয় ভরা যৌবন-সিঁন্দুরে রাঙানো পিয়োনত পীয়ধার পর্ব্বতের ন্যায় উঁচু যে কোন পুরুষের লোভের বস্তু! সে দু'হাত দিয়ে স্তনদ্বয়ে আঙ্গুল চালিয়ে টিপে টিপে পর্যবেক্ষণ (পরীক্ষা) করতে থাকে।

রমার লজ্জা কেটে গেছে। সে চোখ খুলে কথা বলতে আরম্ভ করে,—কি আপনার দাদাকে সুখী করতে পারব তো? এরকম বক্ষযুগল কটা যুবতী'র আছে? ক'জনের সে সৌভাগ্য হয়—দেখুন না আপনার দাদাকে ম্যানেজ করতে পারি কি, না। পরে সব বুঝতে পারবেন।

কামনা: শুধু এই দিয়েই।, অন্য আর কিছু দিয়ে নয়?

রমা: কি যে বলেন লজ্জা লাগে না বুঝি? বলেই নিম্নাঙ্গ ঢাকার চেষ্টা করে হাত দিয়ে।

দেহের কোথাও এতটুকু খুঁত নেই—মাখনের ন্যায় মসৃন। মনে হচ্ছে তোমার দেহে একটি মাছি বসলেও পিছলে যাবে। এতো অয়েলি—মাখনের মতো নরম তোমার শরীর। দেহের প্রতিটি অঙ্গ নিখুঁত সুন্দর। ঈশ্বর সত্যিই তোমাকে সুন্দরী করে পৃথিবীতে এনেছে। অপরূপা সুন্দরী তুমি।

রমা:—কি যে বলেন। আপনিও তো অপরূপা সুন্দরী-এতো সুন্দরী-খুলবেন সবকিছু? কামনা: তোমার দেখতে ইচ্ছে হলে আমায় বিবস্ত্রা কর— আমার আপত্তি নেই। রমা:—কামনার এক ঝটকায় সাড়ী খুলে ফেলে। তারপর ব্লাউজের বোতামে হাত দেয়। আস্তে আস্তে বোতাম খুলে ব্লাউজ এবং পরক্ষণেই ব্রা টেনে উন্মুক্ত করে দেয়। এরপর নিম্নাঙ্গের পরিধানের বস্ত্র

সায়া খুলে-সম্পূর্ণরূপে বিবস্ত্রা করে ফেলে। বলে-বাঃ আপনিও তো দেখছি আমার থেকেও সুন্দরী-সুঠাম দেহ-বুক ও নাভির নিম্নে গোপনাঙ্গ-যে কোন পুরুষের বুকে ঝড় উঠবেই-আঃ কি দারুন ? তুফান তুলবেই যে কোন পুরুষের বুকে—একথা অস্বীকার করতে পারবেন না। কামনা অতঃপর রমার বুক, পিঠ, নিতম্ব বুকের নিম্নাংশ খুব ভালভাবে পরীক্ষা করে দেখতে থাকে। দুই উরুর মধ্যিখান-চমকপ্রদ-তারপর দুই-পা ফর্সা-লোমহীন মসৃন। বুকের খাঁজ সত্যিই সুন্দর।

—নাও চটপট্ এবার সব কিছু পরে নাও। আমিও পরে নিই।

—দু'জনেই ঠিক্ঠাক্ হয়ে ঘর থেকে বাইরে এসে পাশের ঘরে যায়।

এরপর বিয়ের পাকা কথা দিয়ে শুভ'র মা বাবা ও কামনা নমস্কার প্রতি নমস্কার জানিয়ে বিদায় নেয়।

এদিকে শুভ কামনাকে বলে বাঃ বেশ কথা বলছিস্—আমি পাত্রী দেখলাম না—আর তুই বলছিস্ কিনা রাজী হয়ে যা—ওদের পাকা কথা দেওয়া হয়ে গেল। এই ফটোটা দেখে আর কতখানি বোঝা যাবে পাত্রী কি রকম ? বেশী বাড়াবাড়ি করিস্ না—ভাল হবে না বলে দিচ্ছি ?

কামনা : তোকে পাত্রী না দেখলেও চলবে—বুঝলি ? যা দেখলাম না—একেবারে দারুন !

শুভ : কি দারুন দেখলি বল্ না রে ?

কামনা : শুভ'র কানের কাছে মুখ নিয়ে যে কথা বলল তাই শুনে তার মুখ লজ্জায় লাল হয়ে গেল—

শুভ : ফাজিল মেয়ে দাঁড়া দেখাচ্ছি মজা !

কামনা : (হাসতে হাসতে) ছুটে পাশের ঘরে পালিয়ে যায়।

শুভ মনে মনে ভাবতে থাকে—ফটো দেখেতো সুন্দরী মনে হচ্ছে। দেখা যাক্ কি হয় ! একদিন শুভ কামনাকে আড়ালে ডেকে বলল—তোকে একটা সাড়ী দেব একটা কাজ করবি—কাউকে ভুলেও বলবি না কিন্তু !

কামনা : (সব শুনে) রাজী হলো।

যথাসময়ে একদিন রমাকে নিয়ে কামনা হাজির হল সিনেমা হলের সামনে। অমিতাভ বচ্চনের 'শাহেনসা' হিন্দী ছবি চলছিল। এদিকে (প্ল্যান অনুযায়ী) হঠাৎ-ই শুভ ওদের সামনে এসে উপস্থিত—এ কি, কামনা কোথায় যাচ্ছিস ? সঙ্গে কে ?

কামনা : পরিচয় করিয়ে দেয় শুভ (দাদা)'র সঙ্গে এবং জানায় ছবি দেখতে এসেছে।

শুভ : অফিসে তাড়াতাড়ি ছুটী হয়ে গেল—ভাবলাম এতো তাড়াতাড়ি বাড়ী ফিরে কি হবে ? সেইজন্য টিকিট পেলে ভাবছি ফিল্মটাই দেখে যাই—তুই টিকিট পেয়েছিস্ ?

কামনা : এই তো সবে এসেছি—হাউসফুল দেখছি তো ?

শুভ : দাঁড়া ব্ল্যাকে টিকিট পাওয়া যায় কিনা দেখি—বলেই চেষ্টা করতে থাকে। অবশেষে বেশচড়া দামে তিনটি টিকিট এনে বলে চল্ দেরী করিস্ না। তিনজনেই হলে প্রবেশ করে সীটে বসে পড়ে। ছবিটি সবে শুরু হয়েছে—

বেশ মজার ছবি বচ্চনের রঙ্গ তামাশা এবং কোমর দোলানো নৃত্যের তালে গান বেশ উপভোগ্য হয়ে উঠেছে। রমা মধ্যিখানে এবং দু'পাশে কামনা ও শুভ বসে ছবি দেখছে। শুভ মাঝে মধ্যে উত্তেজিত হয়ে (রোমান্টিক দৃশ্যে) রমা'র হাতের ওপর হাত রাখছে। রমা লজ্জায়-হাত সরিয়ে নেয়। একসময় শুভ হাতে চাপ দিল মৃদুভাবে—ইনটারভেল এর পরই প্ল্যানমতো কামনা আসছি বলে সেই যে হল ছেড়ে চলে যায়—আর হলে আসে না। এখন পাশাপাশি শুভ-রমা।

শুভ : কি ভাল লাগছেনা ছবিটা ?

রমা : না, তা নয়—আপনার বোন এখনও আসছে না ?

শুভ : ওর কথা ছাড়ুন, কখন যে কি করে বোঝা যায় না—আসবে নিশ্চয়।

ছবি ইনটারভেলের (Interval) পর পুনরায় আরম্ভ হয়ে গেল। উত্তেজনায় শুভ হাত রাখছে ওর হাতের উপর। এইভাবে ছবি দেখতে থাকে দু'জনেই।

ছবি শেষ হতেই দু'জনে প্রেক্ষাগৃহের বাহিরে এসে একটি কফি কর্ণারে প্রবেশ করে। কফি পর্ব শেষ হলে বাইরে দেখে কামনা আসছে।

অতঃপর তিনজনেই কথাবার্ত্তা বলতে বলতে বাড়ীর উদ্দেশ্যে রওনা হয়। কামনা—রমাকে তার বাড়ী পৌঁছে দেয়। তারপর নিজেদের বাড়ী ফিরে আসে।

—কি দাদা, কেমন লাগলো ?

—মনে তো হচ্ছে মনে ধরেছে।

—দাঁড়া দেখাচ্ছি মজা, এই বলেই ধরতে যায় কিন্তু ততক্ষনে ছুটে পালায় কামনা। একদিন দিনক্ষণ দেখে শুভ'র সঙ্গে রমা'র বিয়ে হয়—

শুভ পরিণয়ে আবদ্ধ হলো "শুভ—রমা।"

কয়েকদিনের মধ্যেই দু'জনে হনিমুন করতে যায় আন্দামানে। দু'সপ্তাহের জন্য জাহাজে চড়ে 'আপার কেবিনে' একটি রুম-এ দু'জন ওঠে। রমা'র মাথা ঘোরে, মাঝে শরীর একটু অসুস্থ হয়ে পড়ে। কয়েকদিনের মধ্যেই আন্দামান-এ এসে পৌঁছয়। কয়েকদিনে জাহাজের ধকলে রমা'র শরীর ভীষণ দুর্বল হয়ে পড়েছিল। শুভ রমাকে নিয়ে ওখানকার লজ্‌হোটেলে এসে ওঠে। সৌভাগ্যক্রমে ডবলবেডের রুম পেয়ে যায়। ঐ দিন স্নান-খাওয়াপর্ব সমাপ্ত করে দু'জনেই বিছানায় গা ভাসিয়ে দেয়। পরদিন সকালে রমা সুস্থ হয়ে হঠে। শুভ তখনও বিছানায় শুয়ে আছে।

—এই ওঠো, ওঠোনা, সকাল হয়ে গেছে।

—উঃ আঃ করে ঘুমের ঘোরে শুয়ে থাকে।

—দাঁড়াও দেখাচ্ছি মজা, উঠবে না বলেই পাশে বালিশ তুলে শুভকে তাক্ করে ছোঁড়ে। গায়ের চাদর ধরে টান মারে।

ততক্ষণে শুভ রমাকে দু'হাত দিয়ে জড়িয়ে ধরে ফেলে এবং বিছানার উপর শুইয়ে দেয়।

—এই ছাড়ো, কেহ দেখে ফেলবে।

—দেখলেই হল, আর যদি বা—দেখে তাতে ক্ষতি কি! আমি তো কোন কুমারী কন্যার সদ্য প্রস্ফুটিত যৌবন…

—থাক্, আর বলতে হবে না।

—কেন-ও নিজের সম্পত্তি—নিজে সামালাচ্ছি তাতে কার কি বলার আছে। পর স্ত্রী নিয়ে তো খেলা করছি না?

—বাব্বা খুব যে দেখছি! সকালবেলাই এতো তা'হলে রাত্রে কি হবে? লক্ষীটি ছাড়, ব্রেকফাস্ট সেরে চলোনা কাছে পিঠে কোথাও ঘুরে আসি।

—ঠিক আছে প্রিয়তমা—চলো তোমার কথাই মানলাম।

দু'জনে ঠিকঠাক্ হয়ে ব্রেকফাস্টের পর বেড়াতে যায়। সুন্দর-মনোরম পরিবেশ। দুর্নিবার এক আকর্ষণ দু'জনকেই টানে। মনে হয় যেন কতো পরিচিত এই পরিবেশ। বেড়াতে বেড়াতে একসময় দু'জনে মনোরম একটি জলবেষ্টিত স্থানে আসে। পাখীর কলকাকলী এবং নাম না জানা মিষ্টিফুলের

সৌরভে চারিদিক মাতোহারা হয়ে যায়। দু'জনেই একটি বৃক্ষের নীচে বসে। পাশে ঝরণার ন্যায় জলের ধারা বয়ে চলেছে। এক মনোরম পরিবেশ সৃষ্টি করেছে। রমা শুভর হাত নিয়ে খেলা করতে করতে বলে—এই বুঝতে পারছ না আমার···

—ও তোমায় নিয়ে পারা গেল না যেখানে সেখানেই ইয়ে ··

—দু'জনেই জড়িয়ে ধরে এবং চুম্বন করে—তারপর মাতোহারা হয়ে ওঠে; এক সময় জড়াজড়ি করে দু'জনে ঝরণার জলে স্নান করতে থাকে। দারুণ এক আনন্দে মধুচন্দ্রিমা পালন করতে থাকে—এক সময় দুজ'নে লজ্ হোটেলএ ফিরে আসে।

রাত্রে খাওয়াপর্ব সমাপ্ত করে একঘণ্টা গল্প করার পর দু'জনেই শুয়ে পড়ে। "হনিমুন" করে দু'জনেই দারুণ আনন্দে চৌদ্দদিন কিভাবে যে কেটে গেল বুঝতেই পারে না; এবার ঘরে ফেরার পালা। হৈ-চৈ করে খুশীতে কাটানোর পর ওখানে কিছু কেনাকাটা সেরে বাড়ীর উদ্দেশ্যে পুণরায় জাহাজে রওনা হয়।

শুভ-রমা বাড়ী ঢুকতেই কামনা বলে—কি এনেছিস্ বল্ দাদা?

—দামী একটি শাড়ী দেয়। এছাড়া বাবার জন্য ধুতি ও পাঞ্জাবী এবং মায়ের জন্য ঢাকাই শাড়ী উপহার দেয়—যুবকটির ঘুম ভেঙ্গে যায়।

হঠাৎ-ই স্বপ্ন ভেঙ্গে যায়। তার দু'বছর পূর্বের অতীতস্মৃতি সেইমুহূর্তে চোখের সামনে থেকে চলে যায়—এতক্ষণ যেগুলো সে ভাবছিল।

এদিকে খাদ্যসামগ্রী ঘরে কিছুই নেই এতক্ষণ তো যৌনক্ষুধায় তারা সবকিছু ভুলে ছিল। হঠাৎ দু'জনেই পরস্পরকে ছেড়ে বিছানা থেকে উঠতে গিয়ে প্রচণ্ড মাথা ঘুরে ওঠে, দুর্বল শরীর দু'জনেই চোখে অন্ধকার দেখে—উঠতে না পেরে দু'জনেই বিছানার ওপর জ্ঞান হারায়।

এদিকে গুণ্ডাদ্বয় প্রচুর পরিমাণে খাদ্য-সামগ্রী জল এবং সংসারের বেশ কিছু দ্রব্যসামগ্রী কাশী থেকে নিয়ে টাঙ্গায় চড়ে কালিকাপুর জঙ্গলে এসে সুড়ঙ্গের মধ্যে দিয়ে তালা খুলে দেখে দু'জনেই অচৈতন্য অবস্থায় বিছানায় নিদ্রামগ্ন। জিনিষপত্র সমস্ত রেখে পুনরায় তালা দিয়ে সে স্থান ত্যাগ করে একসময় কাশীতে ফিরে আসে।

এদিকে কামনা'র জ্ঞান ফিরে আসে। ঘরের মধ্যে অতো খাদ্যসামগ্রী, জল এবং সংসারের কিছু দ্রব্যসামগ্রী দেখে অবাক নয়নে ভাবতে থাকে

—এ কি করে ঘটছে। আশ্চর্য! বহু কষ্টে বিছানা থেকে ধীরে ধীরে উঠে নামে। মাথায় যন্ত্রণা হচ্ছে তবু জল তৃষ্ণায় এসে পিপাসা মেটায় এবং বেশ কিছু খাদ্য খেয়ে শরীরে বেশ খানিকটা বল পায়—জোর পায়। কার্ত্তিককে জাগানোর জন্য চেষ্টা করে। মুখে অল্প কিছু জল দেয়। চোখে জোরে জলের ঝাপটা দেয়, এক সময় কার্ত্তিকের জ্ঞান ফিরে আসে। সেও অবাক হয় প্রচুর পরিমাণে খাদ্যসামগ্রী ও জল দেখে—বলে ঈশ্বর-ই আমাদের জন্য পাঠিয়ে দিয়েছেন।

কামনা কার্ত্তিককে খাবার দেয়। দুর্বল কার্ত্তিক খাবার পর জল পান করে সতেজ হয়ে উঠে—চাঙ্গা হয়ে যায়। দু'জনেই ঈশ্বরকে ধন্যবাদ জানায়।

এইভাবে ওই সুড়ঙ্গের ঘরে দিনের পরদিন মাসের পর মাস অতিবাহিত হতে থাকে—দরজা ভেঙ্গে তারা যে বাইরে যাবে সে উপায় নেই। মেহগনি শক্ত কাষ্ঠের দরজা ভাঙ্গা প্রায় অসম্ভব।

একসময় বুঝতে পারে সে অন্তঃস্বত্বা অর্থাৎ মা হতে চলেছে। কার্ত্তিক যেন একটা পুরুষ সিংহের ন্যায়। কয়েকমাস বাদে সন্তান ভূমিষ্ট হয়।

এই ভাবে দিন অতিবাহিত হতে থাকে। সুখে দিনানিপাত করতে থাকে।

এদিকে হঠাৎ কাশীবাসীর বেশ কিছু ব্যক্তি কালিকাপুর জঙ্গলে সুড়ঙ্গে প্রবেশ করে আস্তে আস্তে তালা খুলে দেখে কামনা—কার্ত্তিকও একটি দেবশিশু গভীর ঘুমে নিমগ্ন। রাত্রি তখন প্রায় দুটো। একজন নিঃশব্দে দু'বাহু দ্বারা শিশুটিকে কোলে তুলে নিল এবং পুনরায় প্রচুর পরিমানে খাদ্য-সামগ্রী রাখিয়া তালা বন্ধ করে দিল। সকলে মিলে শিশুটিকে লইয়া সুড়ঙ্গ মধ্য দিয়ে এক সময় উপরে উঠে আসিল এবং সে স্থান রাত্রেই ত্যাগ করিল।

পরদিন সকাল হতে না হতেই হঠাৎ-ই কার্ত্তিকের ঘুম ভেঙ্গে যায় তখনও চিৎ হয়ে নগ্ন কামনা গভীর ঘুমে নিমগ্ন—; কার্ত্তিক ভাবলো সে স্বপ্ন দেখছে না তো, তাদের শিশুটিকে দেখতে পায় না। ঘরের দিকে তাকিয়ে দেখে অজস্র খাদ্যদ্রব্য রেখেছে কে যেন? কিন্তু শিশুকে ঘরের মধ্যে কোথাও দেখতে পায় না।

কামনা'কে ধাক্কা দিয়ে উঠিয়ে দিল। ঘুম থেকে উঠে কামনা দেখে তার নয়নের মনি নেই—কান্নায় ভেঙ্গে পড়ে।

কার্ত্তিক সান্ত্বনা দিতে থাকে।

কামনা কান্নার মধ্যে কার্ত্তিককে বলে,—"ওগো, আমাকে যেমন করেই হোক্ সন্তান উপহার দাও—সন্তান হারানোর দুঃখ কেমন করে ভুলবো।" কার্ত্তিক বলে, "আঃ ধৈর্য ধর। অতো ভেঙ্গে পড়লে কি করে হবে। ঈশ্বর বোধহয় আমাদের সন্তানকে কোথায় নিয়ে চলে গেলেন কে জানে?" কামনা বলে আমি কিছু জানি না আমাকে শীঘ্র এরকম আরেকটি 'দেবশিশু' উপহার দাও—আমি কোন কথা তোমার শুনবো না, ব্যাস। বেশ কয়েকমাস বাদে সন্তান ভূমিষ্ঠ হয়।

এরপর বাকী কাজ সংযমের সঙ্গে পালন করে কামনাকে সম্পূর্ণ বিশ্রাম দেয়।

এদিকে কার্ত্তিকের পিতা শ্রীমন্ত চক্রবর্ত্তী পুত্রকে কোথাও খুঁজে না পেয়ে পাগলের ন্যায় পথে পথে ঘুরতে থাকেন। মা পদ্মাদেবী পুত্রশোকে একদিন মারা যান।

অবশেষে ঘুরতে ঘুরতে একদিন শ্রীমন্ত চক্রবর্ত্তী কোন একটি লোক মারফৎ খবর পান তার পুত্র-পুত্রবধূ এবং শিশুসন্তান কালিকাপুর জঙ্গলের একটি পোড়ামন্দিরে (সুড়ঙ্গের মধ্যে) বন্দী রয়েছে।

বহু কষ্টে তিনি কালিকাপুর জঙ্গলে পোড়ামন্দিরে পৌঁছন। কিন্তু কিছু দেখতে না পেয়ে পাগলের ন্যায় পাথর ধরে নাড়াচাড়া ও নিজের মাথা ঠুকতে লাগল হঠাৎ-ই অবাক কাণ্ড। পাথর সরে সুড়ঙ্গ দেখা দিল! আনন্দে আত্মহারা হয়ে সুড়ঙ্গের মধ্য দিয়ে মরিয়া হয়ে হেঁটে চলেন—একসময় তিনি একটি ঘরের (তালা বন্ধ) সামনে এসে উপস্থিত। বলপ্রয়োগ তালা সহজে ভাঙ্গে না। পুনরায় বাইরে এসে মোটা গাছের গুঁড়ি এবং বড় পাথর নিয়ে এসে তালা ভাঙ্গার কাজে নিজের প্রচেষ্টা চালিয়ে অবশেষে তালা খুলে ফেলেন। তিনি দেখতে পান বিছানার উপরে একটি দেবশিশু হাত-পা ছুঁড়ে খেলা করেছে তার পাশেই দু'টি নরনারী—

শিশুটিকে তুলে নিতেই দু'জনের ঘুম ভেঙ্গে যায়।

কার্ত্তিক : একি করছেন।

শ্রীমন্ত চক্রবর্ত্তী : কেন-ও আমার নাতিকে কোলে নেব না?

কার্ত্তিক : এতক্ষণে তার পিতাকে চিনতে পারে। বলে বাবা।

আমাকে ক্ষমা করুন। আমি নিজের কথা রাখতে পারিনি। হঠাৎ কি যেন হয়ে গেল—এই আমার স্ত্রী—তোমার বৌমা।

শ্রীমন্ত চক্রবর্ত্তী : আনন্দে বৌমাকে বললেন থাক্ প্রণাম করতে হবে না। আজ এই মুহুর্ত্তে এখানে এক মিনিটও নয় সকলকেই নিয়ে যেতে এসেছি। চলো দেরী করো না।

পোষাক-পরিচ্ছদ সমস্ত কিছু নিজেদের ঠিকঠাক্ করে আহার সেরে সকলেই (পুত্র-পুত্রবধূ-শিশু ও শ্রীমন্ত চক্রবর্ত্তী) কাশীতে ফিরে এলেন। পুত্রবধু কামনা'র সেবাযত্নে শ্রীমন্ত চক্রবর্ত্তী সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে উঠলেন। নাতিকে নিয়ে দিন আনন্দের সঙ্গে তিনি কাটাতে লাগলেন।

এদিকে বড় গোঁসাই ও স্ত্রী ঈশ্বরের সেবায় নিজেদের উৎসর্গ করে 'কামনা'র কথা প্রায় ভুলে গিয়েছিলেন। একদিন লোক মারফৎ খবর পেয়ে দু'জনেই শ্রীমন্ত চক্রবর্ত্তীর বাড়ী এসে উপস্থিত।

আনন্দে আত্মহারা হয়ে তিনি কামনাকে পেলেন। নাতিও পেলেন।

শ্রীমন্ত চক্রবর্ত্তী : আমি ঠিক জানিনা কিভাবে কি হলো ?

বৃন্দাবন গোঁসাই : কি যে বলেন—আপনার দোষ নেই আমার ভাগ্যের দোষ। তা নাহলে এরকম হবে কেন ? ভবিতব্য।

কামনা : তার মাকে জড়িয়ে ধরে বলেন মাগো আমি কিছুই বুঝতে পারিনি।

গীতাদেবী : দূর পাগলী মেয়ে তোর দোষ কি। সবই আমাদের ভাগ্য। কি নাম রাখলি পুত্রের ? আমি রাকেশ নাম দিলাম।

কামনা : ঠিক আছে মা তোমার কথা মতো ওর নাম রাকেশ রাখা হল। কার্তিক কামনা সুখে দিননিপাত করতে থাকে।

পুত্রসন্তান জন্মানোর পূর্ব হতে 'অমাবস্যা' লেগেছিল কামনার দেহে। কার্ত্তিকের মনে হয় মানুষের দেহে/শরীরে 'অম-বস্যা' লাগে কেন' উত্তর পাইনি। রাত্রে দু'জনে মধুর প্রেমালাপে নিমগ্ন :

এই ভাবে দিনের পর দিন, মাসের পর মাস প্রিয়তমাকে নিয়ে স্বর্গের সুখে বিভোর হয়ে যায়। সে ওর রূপের রাজ্যে পরশপাথর খুঁজতে লাগে।*

প্রিয় পাঠকবৃন্দ, সে তখন তার দীর্ঘ কামনার চূড়ান্ত পর্য্যায়ে পৌঁছে গেছে

পাঠকবৃন্দ ভাবে এ যে প্রচণ্ড সেক্সি গল্প ?—কোথায় সেক্স ! সেক্স নেই !! পড় ভাই তাড়াতাড়ি পড়ে শেষ কর। হেভী সেক্স দিয়েছে তো ?

* * *

বৃন্দাবন গোঁসাই সস্ত্রীক কার্ত্তিকের বাড়ী এলেন। কন্যা জামাইকে নিয়ে গেলেন কয়েকদিনের জন্য।

বাঁকুড়া কেঁদতল এক আশ্রমে সকলে বেড়াতে এলেন।

গুরুদেব ক্যামাক্ষাপ্রসাদ মুখার্জী দেহ রেখেছেন। 'গৌরী মা' নামে আশ্রমে বৃদ্ধা বর্ত্তমান। তিনি শিষ্যদের টাকা নিয়ে চ্যবনপ্রাশ, ঘি প্রস্তুত করে টুপি পড়িয়ে বেশী দামে বিক্রয় করে টু-পাইস ইনকাম্ করতেন। যে শিষ্য টাকা দিতে পারত না তার ভাগ্যে জুটতো চরম লাঞ্ছনা। অত্যাধিক যে শিষ্য বাড়াবাড়ি করত 'গৌরীমা' ভাড়াটে গুণ্ডা দিয়ে শিষ্যদের H. M. V. তে পাঠিয়ে দিতেন। কি বুঝতে কষ্ট হচ্ছে ? হ্যাঁ, ঠিকই ধরেছেন—হঠাৎ (H), মায়ের (M) ভোগে (V)। একবার গৌরীমা শিষ্যদের বললেন যে শ্রীপঞ্চমীর দিন রাত্রি এগারটা আটান্ন মিনিটে দেহ রাখবেন সকলেই যেন উক্তদিনে আসেন।

শিষ্যরা নির্দিষ্ট দিনের এসে উপস্থিত, সময় বয়ে যায়, নদীর স্রোতের ন্যায়।' হোমকুণ্ডের ঘরে সকলেই উপস্থিত।

'গৌরীমা' ব্যাঘ্রাসনে গৈরুয়া বস্ত্রে (লাল সিঁন্দুরের টিপ কপালে) উপবিষ্ট জোরে মন্ত্র উচ্চারণ করে চলেছে আর অগ্নিহোমে ঘৃত, পুষ্প, ফল, মধু, চাউল ইত্যাদি দিয়ে চলেছেন। সময় আসন্ন। হঠাৎ একসময় প্রচণ্ড দোলানি শুরু হয়ে গেল। মনে হচ্ছে ভূ-কম্পন অনুভূতি হচ্ছে—হঠাৎ সকলেই বিস্ময়ে দেখলেন একি গৌরীমা নিমেষে চক্ষের পলকে অন্তর্ধান—

ঠিক পর মুহূর্ত্তেই এক বাণী ভেসে এল—"তোমরা সকলে একত্র হয়ে দেশের জন্য সংগ্রাম কর এ সংগ্রাম ভারতবর্ষকে রক্ষা করার সংগ্রাম বাঁচার জন্য—এই দৈন্যদশা থেকে দেশ প্রেমিকদের মতো উগ্রপন্থী দেশবিরোধী অর্থ তছনছ্‌কারী রাঘব বোয়ালদের হাত থেকে দেশকে মুক্ত করো। ঝাঁপিয়ে পড়ো অসৎ ব্যবসায়ী রাজনৈতিক নেতাদের কালো টাকার মুখোসধারী ফিল্মষ্টার-মিনিষ্টার-সুপারষ্টারদের ওপর, বেইমানদের ধ্বংস করে পৃথিবী থেকে সরিয়ে ফেল। শিষ্যগণ, তোমাদের প্রতি আমার সম্পূর্ণ আস্থা-বিশ্বাস

রয়েছে দিকে দিকে ছড়িয়ে দাও আকাশে বাতাসে ভাসিয়ে দাও আমার বীজমন্ত্র।

তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ এখনও দেরী আছে। তখন সত্যে জয় জয়কার হয়ে ভারতবর্ষের রাজা পীতবর্ণ ব্যক্তি হবে-ই। হিংসা বিদ্বেষ লোভ-লালসার হবে অবসান।"

শিষ্যগণ একত্রে 'জয় গৌরীমা' বলে চীৎকার করে উঠলেন। গৌরীমা মেরণের পারে' অমৃত লোকে যাত্রা করলেন।

বাঁকুড়া আশ্রম থেকে সকলে পুনরায় কাশীতে ফিরে এলেন। সকলেই সুখে দিন অতিবাহিত করতে লাগলেন।

আমার কাহিনীর এখানেই ইতি--

ওঁ শান্তি

[চরিত্র : ম=মহারাজা (সূর্যকান্ত), দে=দেওয়ানজী, ঋ=ঋষি, যু=যুবরাজ (মনিকুন্তল), জে=জেলে, ছো=ছোটরানী, ব=বড়রানী, প=পদ্মর মা, মা=মালবিকা, শ্রা=শ্রাবন্তী]

স্থান :— মহারাজা সূর্যকান্তের রাজপ্রাসাদ, সময় : দিবাভাগ।

দে। মহারাজ, ক'দিন দেখছি আপনি খুব চিন্তিত !

ম। হ্যাঁ দেওয়ানজী। বড় রানীর কোন সন্তান হল না। বংশ রক্ষার জন্য আমি আবার বিবাহ করলাম। কিন্তু ছোটরানীও আজ পর্য্যন্ত সন্তানবতী হতে পারলো না। অথচ আমার এই রাজ্য-বিষয়-সম্পত্তি—···।

দে। মহারাজ কিছুদিন হল শুনছি,—এই রাজ্যের প্রান্তে এক আশ্রমে একজন যোগী পুরুষ এসেছেন। তিনি নাকি আশ্চর্য্য রকমের ওষুধ জানেন। তাঁকে একবার—

ম। (বিষন্ন হাসি); দেওয়ানজী ওষুধ, কবচ মাদুলী অনেক কিছুইতো ব্যবহার করা হল।

দে। না মহারাজ, শুনেছি এ সাধুর মুখের কথা নাকি মিথ্যা হয় না। তাই বলছিলাম আপনি যদি একবার আদেশ করেন তো সেই সাধুকে রাজ প্রাসাদে আনার ব্যবস্থা করি।

ম। ঠিক আছে, আপনি যখন বলছেন—ব্যবস্থা করুন।

ঋ। মহারাজ

ম। বলুন ঋষি।

ঋ। এই সন্ধ্যামনি রত্নটি দিয়ে একটি সোনার হার তৈরী করে রাজমহিষীর গলায় পরিয়ে দেবেন। তাহলেই তিনি সন্তানবতী হবেন। তবে কতকগুলো নিয়ম আছে।

ম। বলুন—

ঋ। সন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর এই সন্ধ্যামণি রত্নটি কোন সরবরে নিক্ষেপ করবেন। কারণ এই রত্নটি জলে থাকলে তবেই সন্তানের প্রাণ বাঁচবে, নচেৎ না।

ম। দেওয়ানজী।

দে। বলুন মহারাজ

ম। ছোটরাণী যে এখন তার পিতৃগৃহে আছে।

দে। মহারাজ, আপনার সন্তানের প্রয়োজন। সে ছোটরাণীর হোক আর বড় রাণীরই হোক্। সে আপনারই সন্তান—

ম। আমি বলছিলাম যদি দু'জনকেই এই রত্ন—

ঋ। না মহারাজ। এই রত্নের ব্যবহার শুধু একজনই করতে পারবেন।

দে। মহারাজ শুভস্য শীঘ্রম। ছোট রাণীর অপেক্ষায় বৃথাকাল বিলম্ব করবেন না। এটা বড় রাণীকেই দিন।

[নবজাতকের কান্না]

ম। দেওয়ানজী। হারটা সরবরে নিক্ষেপ করার ব্যবস্থা করেছেন ?

দে। হ্যাঁ মহারাজ। আমি নিজে গিয়ে সে হার জলে নিক্ষেপ করেছি।

ম। যাক্ এতদিন ঈশ্বর আমার আশা আকাঙ্খা পূরণ করেছেন। আচ্ছা দেওয়ানজী পুত্রের কি নাম রাখা যায় বলুন তো ?

ঋ। নাম রাখবেন মণি কুন্তল।

ম, ও দে। একি ঋষি !

ম। আসুন ঋষি। আসুন

ঋ। হ্যাঁ, আজ আপনার সন্তান ভূমিষ্ঠ হবে জানতাম।

ম। আপনি জানতেন ?

ঋ। মৃদু হাসি—

দে। মহারাজ, আমি বলেছিলাম এই ঋষির কথা মিথ্যা হয় না।

ম। সত্যি ঋষি, আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ।

ঋ। মহারাজ, সন্ধ্যামণি রত্নের হারটি সরবরের জলে নিক্ষেপ করেছেন তো ?

ম। হ্যাঁ, ঋষি তা করেছি। আর আদেশ অনুযায়ী পুত্রের নাম রাখবো 'মণি কুন্তল'।

ঋ। হ্যাঁ, সন্ধ্যামণি রত্নধারণের ফলে যার জন্ম তার নাম পুত্র হলে 'মণিকুন্তল' আর কন্যা হলে 'মণিকুন্তলা' রাখতে হয়, মহারাজ।

ম। বলুন ঋষি।

ঋ। সন্তান ভূমিষ্টের নক্ষত্র তিথি লিখে রেখেছেন?

ম। হ্যাঁ ঋষি, রাজপুরোহিতের কাছে লেখা আছে।

ঋ। সেটি আমার প্রয়োজন। আমি আপনার পুত্রের একটি কোষ্ঠি তৈরী করবো।

ম। আমি সব ব্যবস্থা করছি।

ঋ। না না এখুনি প্রয়োজন নেই। পরে একদিন এসে আমি কোষ্ঠী তৈরী করে দেব।

ম। ঋষি, কোষ্ঠী তৈরী হয়েছে?

ঋ। হ্যাঁ, কোষ্ঠী তৈরী সমাপ্ত

ম। কোষ্ঠী রচনায় কোন অমঙ্গল কিছু দেখলেন ঋষি?

ঋ। না মহারাজ! তবে পুত্রের বিবাহের সময় আপনাকে যথেষ্ট সতর্ক থাকতে হবে।

ম। কেন-ও ঋষি! কোন অশুভ ইঙ্গিত—

ঋ। এ্যাঁ! না-না, কোন অশুভ ইঙ্গিত নয়।

ম। তাহলে?

ঋ। মহারাজ, একটা কথা আপনাকে জানিয়ে রাখা ভাল।

ম। বলুন—

ঋ। ঈশ্বর না করুন, অবশ্য সকল মানুষকে একদিন মৃত্যুবরণ করতেই হবে। তাই বলছি যখন মণিকান্তর মৃত্যু হবে তখন ওর দেহ দাহ করা চলবে না। কোন এক সমাধি মন্দির নির্মাণ করে তার মধ্যে ওর মৃতদেহ রাখতে হবে।

ম। ঋষি!

ঋ! বিচলিত হবেন না মহারাজ। আমি এসবই ভবিষ্যতের কথা বললাম। ভবিষ্যৎ মানেই যে ঘটবেই, তা নয়।

ম। ঋষি!

স্থান: ঋষির আশ্রম, কাল: দিবাভাগ

মা। স্বামী।

ঋ। কিছু বলবে মালবিকা ?

মা। বলছিলাম, আপনি তো বহু মানুষের কোষ্ঠী রচনা করেন। আপনার নিজ কন্যার কোষ্ঠী রচনা কবে করবেন ?

ঋ। করবো মালবিকা, সময়ের অভাবে হয়ে ওঠেনি। তবে শ্রাবন্তী'র জন্মমুহূর্ত আমার স্মরণে আছে। চান্দ্রশ্রাবনী তিথিতে ওর জন্ম।

মা। হ্যাঁ, সেই জন্য ওর নাম রেখেছি শ্রাবন্তী।

ঋ। বেশ যোগ্য নাম দিয়েছ –শোন মালবিকা

মা। বলুন স্বামী।

ঋ। তুমি আমার পূজার ব্যবস্থা কর। আমি পূজা সমাপ্তে কন্যার কোষ্ঠী রচনা করবো

মা। কি হল স্বামী, এত রাত হল এখনো কোষ্ঠী রচনা হল না ?

ঋ। না মালবিকা। মনে হচ্ছে আমার গণনায় কিছু ত্রুটী হচ্ছে।

মা। সে তো বুঝতেই পেরেছি। আপনি বার বার কাগজে লিখছেন। আবার কাগজ ছিঁড়ে ফেলে দিচ্ছেন।

ঋ। কন্যার ষোড়ষ বৎসর পর্য্যন্ত হিসেব ঠিক আছে। সপ্তদশ বৎসরে বিবাহ যোগ লক্ষণ দেখছি।

মা। তাহলে গণনায় ত্রুটী বলছেন কেন ?

ঋ। মালবিকা গণনায় দেখছি আমাদের কন্যার ললাটে লেখা আছে, 'সমাধি মন্দিরে ঘর, তোর কপালে মরা বর' !

মা। স্বামী !

স্থান : সূর্যকান্তের রাজপ্রসাদ

কাল : দিবাভাগ।

ম। দেওয়ানজী

দে। বলুন মহারাজ।

ম। বিবাহের সমস্ত আয়োজন সম্পূর্ণ তো ?

দে। হ্যাঁ মহারাজ, তা সম্পূর্ণ, কিন্তু—

মা। 'কিন্তু' কি ?

দে। মহারাজ, মাছ যা আনা হয়েছে তাতে নিমন্ত্রিতদের সংকুলান হবে কিনা তাই ভাবছি।

ম। চিন্তার কি আছে-দেওয়ানজী। যদি বোঝেন যে মাছের সংকুলান হবে না তবে সরোবর থেকেই মাছ ধরার ব্যবস্থা করুন।

খ। আমিও তাই ভাবছিলাম মহারাজ, তাহলে ঐ ব্যবস্থাই করি।

প। মহারাজ—মহারাজ সর্বোনাশ হয়েছে মহারাজ।

ম। কি হয়েছে? হয়েছেটা কি?

প। যুবরাজ অসুস্থ হয়ে পড়েছেন।

ম। এঁ্যা, সেকি! এই কে আছিস রাজবৈদ্যকে সংবাদ দে।

ছো। তুই ঠিক বলছিস্?

প। হিঁ গো ছোট রাণীমা। আমি নিজে কানে শুনেছিনু। একটা হার জলে থাকলে যুবরাজ বেঁচে থাকেন। মনে হয় সেই হারটা ঐ ব্যাটা জেলে নিয়েছে।

দে। মহারাজ, এই ব্যাটা জেলের কাছেই সেই হার—

জে। হুজুর, এই আপনার পায়ে ধরে বলছি হুজুর, আমি হার নিইনি।

দে। মহারাজ এ ব্যাটা মিথ্যে কথা বলছে।

জে! না হুজুর আমি সত্যি বলছি—হার আমি পাইনি।

দে। ফের মিথ্যা কথা। তুই যদি হারটা জল থেকে না তুলবি তো যুবরাজের মৃত্যু হল কি করে? মহারাজ এই জেলেকে সারাজীবন সশ্রম কারাবাসের আদেশ দিন।

ম। দেওয়ানজী, আপনি যা ভালবোঝেন তাই করুন। এই মুহূর্তে আমি কিছু বলতে পারবো না। মণিকুন্তল পুত্র মোর—

প। ছোটরাণী মা—ছোটরাণী মা।

ছো। কি রে পেয়েছিস?

প। হিঁ গো ছোটরাণী মা। একটা মাছের পেটে ছিলো এই হার।

ছো। দে, দে—তাড়াতাড়ি দে, লুকিয়ে রাখি।

দে। মহারাজ

ম। কি সংবাদ দেওয়ানজী, সমাধি মন্দির প্রস্তুত?

দে। হ্যাঁ মহারাজ, আপনার আদেশ মত নদীর ধারেই সমাধি মন্দির তৈরী করা হয়েছে।

ম। তাহলে এবার মণিকুন্তলের মৃতদেহ মন্দিরে রেখে আসবার ব্যবস্থা করুন।

ব। মা—আমার মণিকুন্তলকে নিয়ে যেতে দেব না।

ম। বড়রাণী! উতলা হয়ো না। শোনো বড়রাণী। ঋষির কথা আমাকে পালন করতেই হবে।

ব। কিন্তু পুত্র হারা হয়ে আমি কি করে থাকবো?

ম। পুত্র যখন ছিলো না তখন যে ভাবে ছিলে এখন সেই ভাবেই থাকবে।

ব। পারবো না মহারাজ, আমি পারবো না।

ম। পারতেই হবে বড় রাণী। এযে বিধির বিধান। একে লংঘন করার ক্ষমতা কারো নেই।···দেওয়ানজী, মণিকুন্তলের মৃতদেহ মন্দিরে রেখে আসবার ব্যবস্থা করুন।

ব। মণিকুন্তল—হায় পুত্র মোর····।

স্থান : ঋষির আশ্রম

কাল : দিবাভাগ

মা। শ্রাবন্তী—শ্রাবন্তী—

শ্রা। আসছি মা—মা, আমায় ডাকছিলে?

মা। হ্যাঁ, কি করছিলে?

শ্রা। ফুল গাছে জল দিচ্ছিলাম।

মা। তোমার পিতা কোথায় গেছেন, বলতে পারো?

শ্রা। না মা। তিনি কিছু বলে যান নি।

মা। তাই তো! কোন সকালে বেরিয়েছেন। দুপুর গড়িয়ে বিকেল হল এখনো এলেন না।

ঋ। শ্রাবন্তী—কোথায় গেলি মা—

শ্রা। মা, ঐ তো পিতা এসে গেছেন। পিতা-পিতা, আপনি কোথায় গিয়েছিলেন, আমরা খোঁজাখুঁজি করছি।

ঋ। গিয়েছিলাম তোমার শাশুড়ীমাতার খোঁজে।

শ্রা। পি-তা।

ঋ। (মৃদুহাসি) আমার শ্রাবন্তী মায়ের শাশুড়ীর সন্ধান পাওয়া কি সহজ কথা!

মা। শ্রাবন্তী, তুমি যে কাজ করছিলে করোগে যাও।

শ্রা। যাচ্ছি মা।

ঋ। কি ব্যপার মালবিকা। তোমাকে কেমন যেন রাগান্বিত মনে হচ্ছে ?

মা। স্বামী, আপনি কি ভুলে গেছেন শ্রাবন্তীর কোষ্ঠীর কথা।

ঋ। না মালবিকা ভুলিনি। তবে সপ্তদশ বৎসরে ওর বিবাহযোগ, একথা অনিবার্য্য। সুতরাং পিতা হয়ে আমি নিশ্চেষ্ট হয়ে বসে থাকি কি করে ?

মা। আমি বলছিলাম—সপ্তদশ বৎসরে বিবাহযোগে যখন অমঙ্গল দেখা দিয়েছে তখন অষ্টদশ বৎসরে ওর বিবাহ দেব।

ঋ। না মালবিকা। ভবিষ্যৎ যতই ভয়ঙ্কর আর বিভিষীকাময় হোক্ না কেন মানুষকে সেই আঁধারে পা-ফেলেই চলতে হবে।

মা। স্বামী। তার মানে আপনি সব জেনেও—

ঋ। হ্যা মালবিকা। আমি জানি এই সপ্তদশ বৎসরে ওর বিবাহ যোগ। আর সেই বিবাহ এক মৃত বরের সাথে।

মা। স্বামী, ভবিষ্যৎ—ললাটলিখন। এ সবের দোহাই দিয়ে আপনি শ্রাবন্তীর জীবনের দুঃখকে মেনে নিতে চাইলেও আমি মা হয়ে তা পারবো না।

ঋ। কিন্তু আমি যে গণনার মাধ্যমে—

মা। আমি বিশ্বাস করি না।

ঋ। মালবিকা। তুমি আমার জ্যোতিষশাস্ত্রকে বিশ্বাস করো না ? একথা তুমি আজ বলতে পারলে ?

মা। অপরাধ ক্ষমা করুন স্বামী। আপনার ভবিষ্যদ্বাণী মিথ্যা হবার নয় আমি জানি। তবু নিজ কন্যার এতখানি সর্ব্বনাশ হবে ভেবে আমি নিজেকে সংযত রাখতে পারিনি। তাই আপনার বিদ্যাকে আমি অস্বীকার করার ধৃষ্টতা প্রকাশ করেছি। তবে আমি আর একটি অপরাধ করবো তার জন্য আমি আপনার নিকট ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি।

ঋ। মালবিকা।

মা। হ্যা, স্বামী, আমি আজই শ্রাবন্তীকে নিয়ে আমার পিতার গৃহে যাব। সেখান থেকে ফিরবো এক বৎসর পরে।

ঋ। কেন এই সংকল্প কেন ?

মা। এই বৎসর আমি শ্রাবন্তীর বিবাহ দেব না। এই আমার দৃঢ় সংকল্প।

ঋ। (স্বগত) ভবিতব্যকে খণ্ডন করার ক্ষমতা ঈশ্বরের নেই। তুমি তো কোন্ ছাড়!

স্থান: নির্জন পথ, সময়: আসন্ন সন্ধ্যা

শ্রা। মা, সন্ধ্যার অন্ধকার নামছে। আরো কত পথ বাকী মা?

মা। অনেক পথ বাকী, একটু জোরে চল—

শ্রা। আর পারছি না। পায়ে ভীষণ ব্যথা লাগছে।

মা। একটু কষ্ট কর মা। সন্ধ্যা হবার আগে ঐ—গ্রামটাতে যেতেই হবে।

শ্রা। মা, আজই কেন মামার বাড়ী যাবার ঠিক হল?

মা। সে পরে শুনবে। এখন একটু তাড়াতাড়ি চল· আবার বুঝি আকাশে মেঘ করছে!

শ্রা। হ্যাঁ, মা। সারা আকাশ কালো মেঘে ছেয়েছে। মা! ঝড়বৃষ্টি হলে কোথায় দাঁড়াবো মা। সামনে তো কোন বাড়ী ঘরদোর নেই।

মা। একটু তাড়াতাড়ি চল—ঐ গ্রামটায় তো যেতেই হবে।

শ্রা। মা—মা।

মা। শ্রাবন্তী—শ্রা-ব-ন্তী···

স্থান: সূর্যকান্তের অন্দরমহল কাল: রাত্রি

ছো। তুই ঠিক জানিস? সমাধি মন্দিরের দরজা বাহির থেকে বন্ধ থাকে?

প। হ্যাঁ গো ছোট রাণী মা। আমি নিজে চোখে দেখে এসেছি।

ছো। তাহলে রাত্রে ওই হারটা জলে ডুবিয়ে রাখলে যুবরাজ বেঁচে থাকবে! অথচ বাইরে বেরোতে পারবে না!

প। আর কোনদিন খেতে না পেয়ে একদিন সত্যি মরে যাবে।

ছো। তখন এই হার আমি পরতে পারবো।

প। তাহলে আপনার কোলে একটা ফুটফুটে চাঁদের মত ছেলে আসবে

ছো। তাহলে প্রত্যেক রাত্রে হারটা জলে ডুবিয়ে রাখবো। দিনের বেলায় দিলে সবাই জানতে পারবে।

প। আমি তাহলে এক ঘড়া জল নিয়ে আসি?

ছো। তাই যা, নিয়ে আয়।

স্থান: সমাধি মন্দির, কাল: রাত্রি

যু। (স্বগত) বাঃ কি সুন্দর জ্যোৎস্না উঠেছে। আমার বাইরে যেতে ভীষন ইচ্ছে করছে। কিন্তু দরজাটা যে বাহির থেকে বন্ধ। আরে! ওখানে কে যেন শুয়ে আছে। হ্যাঁ, হ্যাঁ চাঁদের আলোয় স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে একটা মেয়ে শুয়ে আছে।

যু।—(প্রকাশ) এই শুনছো। কে তুমি? শুনতে পাচ্ছ?

শ্রা। (ভয়) কে?

যু। ভয় নেই। আমি মানুষ। এই মন্দিরের মধ্যে আটকে আছি। তুমি শিকলটা খুলে দিতে পার?

শ্রা। আপনি কে?

যু। সে পরে বলছি। তুমি আগে ঘরের শিকলটা খুলে দাও। না না। আমি তোমার কোন ক্ষতি করবো না; ঈশ্বরের দোহাই।

শ্রা। আপনাকে কারা এই মন্দিরে আটকে রেখেছে?

যু। জানি না। তবে আমি এই রাজ্যের রাজা সূর্যকান্ত'র পুত্র। আমার নাম মনিকুন্তল। তুমি শিকলটা খুলে দাও। আমি বাহিরে গিয়ে সব তোমাকে বলবো।·· একি তুমি সম্পূর্ণ ভিজে গেছ?

শ্রা। হ্যাঁ, আমি আর মা—মামার বাড়ী যাচ্ছিলাম। হঠাৎ ঝড়জলের মধ্যে আমরা একে অপরকে হারিয়ে ফেলি। তারপর আমি অজ্ঞান হয়ে যাই। আপনার ডাকে জ্ঞান ফিরে পেয়ে দেখি এই মন্দিরের কাছে পড়ে আছি।

যু। তোমার নাম কি?

শ্রা। শ্রাবন্তী। এই শ্রাবণী পূর্ণিমা তিথিতে আমার জন্ম তাই আমার নাম শ্রাবন্তী।

যু। বেশ সুন্দর নাম। কিন্তু তুমি শীতে (ঠাণ্ডায়) কাঁপছো। এক কাজ করো। ঘরের ভিতর বিছানায় একটা চাদর আছে। সেটা পরে ভিজে কাপড় ছেড়ে রাখো। না না সংকোচ বোধ করার কিছু নেই। এই ভিজে কাপড় দেহে থাকলে শরীর খারাপ হবে। যাও, ঘরের ভিতর যাও।

স্থান: সূর্যকান্তর অন্দরমহল কাল: রাত্রি

প। ছোটরাণী, ছোটরাণী

ছো। যুঁ্যা—কিছু বলবি

প। ভোর হয়ে আসছে, এবার হারটা জল থেকে তুলে রাখতে হবে

ছো। হ্যাঁ হ্যাঁ, আর একটু পরেই তুলে রাখবো।

স্থান : সমাধিমন্দির ; কাল : রাত্রি

শ্রা। তারপর ?

যু। তারপর আমি বড় হলাম। যথাসময়ে আমার বিবাহের সমস্ত আয়োজন সম্পূর্ণ হঠাৎ আমার বুকের মধ্যে প্রচণ্ড যন্ত্রনা। আমি তখনি অচৈতন্য হলাম। তারপর আর কিছু মনে নেই।...তারপর আজ রাত্রে জেগে দেখি এই মন্দিরের ভিতর শুয়ে আছি। কিন্তু দরজা বাহির থেকে বন্ধ। তুমি শিকল খুলে দিতে আমি বাহিরে বেরিয়ে এলাম। এই জ্যোৎস্নালোকে স্নান (অবগাহন) করতে পারলাম।

শ্রা। (স্বগত) ভারি আশ্চর্য্য! অদ্ভুত—

যু। কি ভাবছো ?

শ্রা। য়্যঁ—হ্যাঁ ভাবছি—

যু। আঃ!

শ্রা। কি হলো ? যুবরাজ শুনছেন।

যু। আমাকে ঘরে শুইয়ে দেবে চলো।

শ্রা। হ্যাঁ, হ্যাঁ চলুন, আমার কাঁধে ভর দিয়ে চলুন।

......যুবরাজ শুনছেন। আশ্চর্য্য। যুবরাজের প্রাণস্পন্দন নেই। অথচ আবার উনি জেগে উঠবেন। কিন্তু কি এর রহস্য? না। ভোর হয়ে আসছে। নিজের শাড়ী পরে নিয়ে ঘরের শিকল তুলে দিয়ে যাই মায়ের খোঁজ করি। আরে! কারা যেন এদিকে আসছে মনে হচ্ছে। হ্যাঁ, হ্যাঁ মনে হচ্ছে এ রাজ্যের রাজা—যাই বৃক্ষের আড়ালে লুকিয়ে থাকি।

ম। দেওয়ানজী ? ঘরের শিকলটা খুলে দিন।

দে। এই যে মহারাজ খুলছি।

ম। মনিকুন্তল! পুত্র মোর! হায় ঈশ্বর! আর কতদিন এভাবে মৃত পুত্রের মুখ দেখতে আসতে হবে ? তার চেয়ে আমাকে নাও ঈশ্বর। আমাকে নাও।

দে। মহারাজ চোখের জল যুবরাজের শিয়রে পড়বে। চোখ মুছুন মহারাজ।

ম। দেওয়ানজী।

দে। এই নিন এই ফুলের মালাটা যুবরাজের দেহের উপরে বিছিয়ে দিন।

ম। মনিকুন্তল! পুত্র মোর।

দে। মহারাজ চলুন। এবার ফিরতে হবে!

শ্রা। (স্বগত) দু'জনেই বেরিয়ে আসছে। একজন চোখের জল মুছতে মুছতে আসছে।

ম। দেওয়ানজী, আমাকে যুবরাজের বিছানাটা কেমন যেন অগোছালো মনে হচ্ছে।

দে। গতকাল ঝড়ে হয়তো একটু সরে গেছে।

ম। হ্যাঁ তাও হতে পারে। জানালাটা খোলা থাকে তো।

শ্রা। (স্বগত) ইনিই মনে হয় রাজা সূর্যকান্ত! কিন্তু যুবরাজের এই জীবন মরণের রহস্য আমাকে খুঁজে বার করতেই হবে।

স্থান : সূর্যকান্তের অন্দরমহল, কাল : দিবাভাগ

শ্রা। হ্যাঁ গো ছোট রাণী মা। আমি নাপিতের ঝি। আপনার চুল বেঁধে দিতে পারবো, নোখ কেটে দিতে পারবো। গা-হাত-পা মালিশ করতে পারবো।

ছো। তা ভালো গো নাপিতের ঝি। তুমিতো দেখছি অনেক কাজ করতে পারো।

শ্রা। (স্বগত) না পারলে রহস্য উদ্‌ঘাটন হবে কি করে। মহারাজের সন্দেহ ছোটরাণীর কাছেই সেই হার আছে। আর আমাকে তা উদ্ধার করতে হবে।

ছো। কি গো নাপিতের ঝি—মনে মনে কি ভাবছো?

শ্রা। এঁ্যা, হ্যাঁ হ্যাঁ সে আপনার আশীর্বাদে সব কাজই পারি। যেমন ধরুণ সাত-আট রকমের খোঁপা বাঁধতে পারি। নোক্‌পালিশের নক্‌সা আঁকতে পারি।

ছো। তা বেশ বেশ। তুমি তাহলে আজ থেকেই আমার কাজে লেগে যাও। কই গো পদ্মর মা, এদিকে শোনো।

প। ছোট রাণী মা আমায় ডাকছিলেন?

ছো। এই মেয়েটা আজ থেকে আমার কাজ করবে। একে সব দেখিয়ে-শুনিয়ে দাও। (ফিস্‌ফিস্) আর শোন—

প। বলেন—

ছো। হারের কথা যেন না জানতে পারে।

প। না ঘুনাক্ষরেও জানতে পারবে না। আপনি নিশ্চিন্তে থাকুন। নাও গো নাপিতের ঝি। রাত হল শুয়ে পড়ো।

শ্রা। হ্যাঁ শোব। তা তুমি কোথায় যাচ্ছ?

প। যাই ছোট রাণীমার ঘরে জল দিয়ে আসি।

শ্রা। ছোট রাণীমা বুঝি রোজ রাত্রে অনেক জল খান?

প। আর বলো কেন বাছা। রোজ রাত্রে একঘড়া জল চাই-ই।

শ্রা। কিন্তু ও ঘরাতে তো পুকুরের জল আছে।

প। ঐ জলই খায় তো। নাও তুমি শুয়ে পড। আমি জলটা দিয়ে আসি—

শ্রা। (স্বগত) ছোট রাণীমা একঘড়া জল খান। তাও পুকুরের জল। না! ব্যপার কেমন যেন সন্দেহজনক। যাই চুপি চুপি গিয়ে দেখে আসি—

ছো। এনেছিস্।

প। হিঁগো ছোট রাণীমা। জল এনেচি।

ছো। দে, ঘড়ার মধ্যে হারটা ডুবিয়ে রাখি। যুবরাজ একটু বেঁচে উঠুক।

শ্রা। (স্বগত) হুঁ! যুবরাজের মরা বাঁচার রহস্য তাহলে এই। নাঃ আর এক মুহূর্ত দেরী নয়। মহারাজকে সংবাদ দিই।

স্থান : সমাধিমন্দির কাল : রাত্রি

যু। শ্রাবন্তী—শ্রাবন্তী—তুমি কোথায়? শ্রাবন্তী দরজা খুলে দাও। আমি বাহিরে যাব। শ্রাবন্তী তুমি আসছনা কেন শ্রাবন্তী—

শ্রা। আসছি যুবরাজ—

যু। শ্রাবন্তী—

শ্রা। এই যে যুবরাজ আমি এসেছি। আর দেখো কাদেরকে সঙ্গে এনেছি।

যু। কে? মা—! বাবা!

ব। মনিকুন্তল—

ম। পুত্র মোর।

স্থান : রাজপ্রসাদ, কাল : দিবাভাগ

ম। দেওয়ানজী

দে। বলুন মহারাজ।

ম। ঐ সন্ধ্যা মনিরত্নের হারটি এবার ঐ মন্দিরের মধ্যের একটা সোনার ঘড়ার মধ্যে রেখে দেবেন। আর সদাসর্ব্বদা সতর্ক প্রহরীর ব্যবস্থা করে দিন।

দে। যথা আজ্ঞা মহারাজ।

ম। আর সেই জেলেকে কারাগার থেকে মুক্তি দিন। পরিবর্তে ছোটরাণী আর তার দাসীকে (পদ্ম) কারাগারে নিক্ষেপ করুন।

দে। মহারাজ।

ম। আমার আদেশ।

ছো। মহারাজ আমায় ক্ষমা করুন মহারাজ

ম। না, তোমার মত নারীকে ক্ষমা নয়।

যু। পিতা। আমার অনুরোধ। ছোটমায়ের অপরাধ মার্জনা করুন।

ম। মণিকুন্তল।

যু। হ্যাঁ পিতা, যত অন্যায় করেই থাকুক। মা হয়ে উনি কারাগারে থাকবেন আর আমি পুত্র হয়ে তাই সহ্য করবো? না তা পারবো না পিতা!

ছো। মণিকুন্তল। আমায় ক্ষমা কর বাবা।

যু। না। ছোটমা, আজ কোন অন্যায় নয়, কোন ক্ষমা নয়। আজ সমস্ত দ্বেষ হিংসা ভুলে আসুন আমরা সবাই আনন্দ করি।

ম। হ্যাঁ পুত্র, তোমার ইচ্ছাই পূর্ণ হোক। আজ শুধু আনন্দ, আর সে আনন্দ তোমার আর শ্রাবন্তীর বিবাহের আনন্দোৎসব। দেওয়ানজী।

দে। বলুন মহারাজ।

ম। রাজ্যের সমস্ত প্রজাদের নিমন্ত্রণ করুন। যুবরাজের বিবাহ, নিমন্ত্রিত হতে কেউ যেন বঞ্চিত না হয়।

ঋ। সেই সঙ্গে আমরাও নিমন্ত্রিত হবো তো মহারাজ।

শ্রা। এ কি পিতা আপনি এখানে?

মা। (স্বগত) পিতা। (প্রকাশ্যে) শ্রাবন্তী তাহলে আপনার কন্যা?

ঋ। হ্যাঁ, মহারাজ। শ্রাবন্তী আমার কন্যা। এই আমার স্ত্রী।

শ্রা। মা—

মা। শ্রাবন্তী—

ম। বাঃ কি অপূর্ব যোগাযোগ

ঋ। এ সবই মঙ্গলময় ঈশ্বরের ইচ্ছা। তিনি যা করেন মঙ্গলের জন্যই।

ম। দেওয়ানজী, আপনি এখনো দাঁড়িয়ে আছেন, বিবাহের ব্যবস্থা করুন।

যু। শ্রাবন্তী—। (আবেগে)

শ্রা। যুবরাজ—(আবেগে)

সমর্পণ

প্রথমেই হুগলী শহরটাকে দেখা যাচ্ছে। তারপরই কিছু বাস, রিক্সা, লরী, টেম্পো ইত্যাদি দেখানোর পর—অমরের বাড়ী। মা ছাড়া কেহ কোথাও নেই। অমর বাবার অফিসে পেনসন আনতে গেছে। মা সেলাই করছিল। অমরের এক বন্ধু অশোক। এদের দু'জনের গভীর বন্ধুত্ব। অমর দরজায় কড়া নাড়তেই—কে?

—আমি অমর। —খোকা, খোকা এসেছে। মা দরজা খুলে দেয়। তোর এত দেরী হল?

—আর বোল না মা। বাবার অফিসে দারুণ ভীড় অনেকেই পেনশন নিতে এসেছে। এতক্ষণ বসে থেকে তবে টাকা পেলাম।

—তোর বন্ধু অশোক এসেছিল। তোর আসতে দেরী দেখে চলে গেছে।

—এই নাও পেনশনের টাকা। আমার একটা চিঠি এসেছে শুনলাম। হ্যাঁ, এই নে—অমর চিঠিটা পড়ে বলে চাকরীর Appointment Letter বেশ কিছুদিন আগে Rly Dept খালাসির Interview দিয়েছিলাম—তারই···এমন সময় দরজায় কড়া নাড়ার শব্দ! খুলেই দেখে অশোক প্রাণের বন্ধু। অশোকের বাবা ছাড়া কেউ নেই। অমরের মাকে 'মা' বলে প্রাণের বন্ধু।

—এই যে রেল ডিপার্টমেন্টের রাজা-চাকরী পাওয়ার জন্য তোকে ধন্যবাদ। এই চাকরীতে Join কর পড়ে ভাল পেলে ছেড়ে দিবি। পরের দিন—Rly office. একজন ভদ্রলোক চেয়ারে বসে কাজ করছিলেন।

—May I come in Sir? Yes Come in--অমর ভেতরে ঢুকে খামটা এগিয়ে দেয়। চিঠিটা পড়ে ভদ্রলোক বলে দেখুন কুসুমপুর হল্টে একজন খালাসির প্রয়োজন। ওখানে একজন Incharge আছেন, আপনি শীঘ্রই ওখানে গিয়ে Join করুন।

ঠিক আছে স্যার আমি কালকেই ওখানে যাব, নমস্কার।

—ও কে উইস্ ইউ গুডলাক।

বাড়িতে অমর জিনিষপত্র গোছগাছ করছিল। টেবিলে দুটো রুমাল আছে নিয়ে এসো তো মা। মা রুমাল আনতে ভেতরে চলে যায়।

অশোক—বন্ধু শুনেছি ওখানে অনেক সুন্দরী মেয়ে আছে। কাজেই বন্ধু—চোখ মারে।

—রুমাল এনে দেয়। মাকে প্রণাম করে দু'জনেই স্টেশনের পথ ধবে।

—কুসুমপুয হল্টে এখানে দু' চারখানা গাড়ী স্টপেজ। ছোট স্টেশন, এখানে একজন Incharge আছেন। গাড়ী তখন আসছে। Incharge জলের বালতী নিয়ে Platform-এ দাঁড়ায়। ট্রেন দাঁড়িয়ে পড়ে। প্যাসেঞ্জার যারা যাবার তাড়া বাড়ী চলে যায় Driver (ইঞ্জিনম্যান) নেমে জল খেয়ে আবার উঠে পড়ে। Incharge পতাকা দেখায়, ট্রেন ছেড়ে দেয় Incharge আবার অফিসে এসে বসে অমর অফিসে ঢুকে খামটা এগিয়ে দেয়।

—তুমি এসে গেছ। ভলাই হয়েছে, কাল তোমার Order-এর কপি পেয়েছি। স্টেশনটা খুবই ছোট্ট। তোমার কাজ প্যাসেঞ্জারদের জল দেওয়া।

—আপনাকে আমি কাকাবাবু বলেই ডাকবো?

—আরে হ্যাঁ, হ্যাঁ তোমার যা খুশী তুমি তাই বলেই ডেক—পাশেই কুসুম-পুর গ্রাম। তোমার থাকার জন্য একটা ঘর ঠিক করে রেখেছি। চল দেখবে—চলুন, দু'জনেই গ্রামের পথ ধরে। তখন সন্ধ্যে হয়ে গেছে। গ্রামের সবকিছু দেখাতে/চেনাতে থাকে, ঐ ঘরটা তোমার জন্য ঠিক করে রেখেছি। আচ্ছা তুমি তাহলে আজকের মত বিশ্রাম কর। কাল থেকে Duty-তে যাবে। কাকাবাবু চলে যায় সুটকেসটা তুলতে যাবে দেখে একটা লোক নাম মোহন।

মদ খেয়ে গুণ গুণ করে গান গাইতে গাইতে আসছে। একে গাঁয়ের লোক খুবই ভালবাসে। মোহন এই গ্রামকে খুব ভালবাসে। চলে যেতে থাকে। অমর বাড়ীর ভিতরে ঢুকতে যাবে—এমন সময় এই গাঁয়েরই নাম অজয় মদ খেয়ে শুধু বলে চলে—'তুতুও আসবে না, আমিও বাঁচবো না'—এই কথাটা বলতে বলতে চলে আসে। তুতু বলে একজন বড়লোকের মেয়েকে সে ভালবাসতো। তুতু বড়লোক, অজয় গরীব—তুতুর বাড়ী বহরমপুর এই গ্রামে কাকার বাড়ী। হঠাৎ অজয় অমরের সামনে পড়ে যায়। অমর ওকে তুলতে থাকে। কোথায় যাবে তুমি? চল তোমাকে পৌঁছে দিয়ে আসি।

—থাক, আমি যেতে পারবো। 'তুতুও আসবে না—আমিও বাঁচবো না বলে পথ চলতে থাকে। কয়েকদিন পর—গ্রামে রঞ্জনার বাড়ী। মা ছাড়া কেহ নেই। রঞ্জনা দেখতে খুব সুন্দরী। মায়ের বয়স হয়েছে। ওর এক বান্ধবী সোমা, দেখতে একটু মোটা। রঞ্জনা মধ্যবিত্ত। সোমার মা-বাবা আছে! সোমা মোটা বলে অজয় রাগায়। গ্রামে সকালবেলা—একটা গরুকে রঞ্জনা দড়ি বেঁধে ঘর থেকে বাইরে আনে। রাস্তায় এসে গরুটা দাঁড়িয়ে পরে—

রঞ্জনা প্রচণ্ড টানতে থাকে কিন্তু গরুটা রাস্তা ছেড়ে সরে না—এদিকে অমর Duty যাবে বলে ঐ রাস্তা ধরে কাছে এসে দাঁড়িয়ে পরে পরস্পর পরস্পরের দিকে তাকিয়ে অল্প হাসে। গরুটা সরতেই অমর রাস্তা পেয়ে চলে যেতে থাকে। রঞ্জনা হেসে তাকায়। অমর দু' একবার তাকায়। পরে রঞ্জনা গরুটাকে নিয়ে একটা গাছে বাঁধছিল। সোমা এসে দাঁড়ায়—বলে মাকে সন্ধ্যের গাড়ীতে স্টেশনে দিয়ে আসবো—চলে যাবে। —ঠিক আছে যাব।

এদিকে অমর কুসুমপুর হল্টে দাঁড়িয়েছিল। এমন সময় কাকাবাবু বলে—অমর Goods-এর গাড়ীর সময় হয়ে গেছে ওটা পাশ করে দিয়ে বাড়ী চলে যেও। গাড়ী প্রচণ্ড Speed-এ আসতে থাকে। বেরিয়ে চলে যায়। পরে বিকেলবেলা—সোমা, মা, রঞ্জনা স্টেশনে-এ আসছে গাড়ী ধরবে বলে। —কি গো দিদি ভাল আছেন? কোথায় যাওয়া হচ্ছে।

—বোনের বাড়ী চললাম। আসি দিদি, ট্রেনের সময় হয়ে গেছে। এদিকে অমর স্টেশনে গাড়ীর জন্য জলের বালতী নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে—

প্যাসেঞ্জার সকলেই অপেক্ষা করছে। অমর রঞ্জনাকে দেখে হাসে। রঞ্জনাও মুচকি হাসে। —চল্ সোমা একটু জল খেয়ে আসি।

দু'জনে অমরের কাছে এসে জল চায়। —জল খাবে, নাও। মাথা নীচু করে জল খেতে থাকে। কিছু জল গলায় আটকাতে দু' চারবার কেশে ওঠে—কি হল? —কিচ্ছু না। ট্রেন চলে আসে স্টেশনে। মা ট্রেনে উঠে পড়ে। —একসময় ট্রেন ছেড়ে দেয় সোমা ও রঞ্জনা বাড়ীর পথ ধরে। কাকাবাবু অফিস ঘরে বসেছিল। জলের বালতী নিয়ে এসে রাখতেই— অমর এল। এখানে কেমন লাগছে। তুমি এখন বাড়ী চলে যাও—গুডস্ এর ট্রেন আমি পাশ করে দেব। অমর বাড়ীর কাছাকাছি যেতেই অজয় আবার মদ খেয়ে চলে আসতে থাকে তুতুও আসবে না, আমিও বাঁচবো না। কে ওখানে? তোর বন্ধু অমর। তুতু মেয়েটা কে? —না, মদের ঘোরে অমনি অনেক কিছুই বেরিয়ে যায়—চলি। পরেরদিন অজয় স্বপ্ন দেখতে থাকে—তুতু কাকার বাড়ীর বাইরে একটা সাদা ছাগলের বাচ্চাকে আদর করছিল। অজয়কে দেখে তুতু হাসে—বাঃ বাচ্চাটা খুব সুন্দর তো? এমন সময় শ্যামলী ঐ গাঁয়েরই মেয়ে তুতুর বান্ধবী দাঁড়ায়— —অজয় দা। —তুই।

—তুতুর কাছে এলাম। আর কতদিন ওর মনে দুঃখ দেবেন? ও বহরমপুর থেকে শুধু আপনার জন্যই কাকার বাড়ী এখানে চলে আসে। আমি যাই কেমন, বলেই ওখান থেকে চলে যায়।

তুতু বলে জানিস্ শ্যামলী আমি আজ দু' বছর হল ওর জন্যই গ্রামে আসি। কত বাহানা করে এখানে আসতে হয় কিন্তু—

—একটা গরীব ছেলের জন্য ভেবে আর কি লাভ?

—শ্যামলী এরকম কথা যেন তোর মুখ থেকে আর শুনতে না পাই। ও গরীব হলেও ওর মনটা কত মহান্ তুই বুঝতে পারবি না। যতদিন না ওর কাছ থেকে Response পাচ্ছি বসে আমাকে থাকতেই হবে।

অমর Duty থেকে বাড়ী ফিরছিল। অজয়কে ডাকে—অজয়ের স্বপ্ন ভেঙ্গে যায়। তুই যে বলেছিল এই গ্রামের শেষে একটা মন্দির আছে। জাগ্রত কালির মূর্ত্তি আছে। কই আমায় দেখাতে নিয়ে গেলি না?

—বিশ্বাস কর, একদম ভুলে গিয়েছিলাম। কাল অমাবস্যা, পূজো তুমিও

চলো। পুজোও দেখা হবে মন্দিরের দর্শনও হবে। কাল যাবি কখন? সকালে। সকালে তো আমার Duty. — কাল Duty দেরী করে যাবে।

পরেরদিন গ্রামের মন্দিরে সবাই পুজো দিতে যাচ্ছে। রঞ্জনা, সোমা পূজো দিতে যাচ্ছে। অমর, অজয়, পুজো দেখতে যাচ্ছে। হঠাৎ অমর রঞ্জনাকে দেখে দাঁড়িয়ে পরে। রঞ্জনাও দাঁড়িয়ে পড়ে—দু'জনেই অল্প হাসে। অমর ফিরে চলে যেতে থাকে। —কি গুরু, ভগবানের দর্শন না করেই চলে যাচ্ছ। —কালী দর্শন হয়ে গেল অজয়? Duty দেরী হয়ে যাচ্ছে, অমর চলে যায়। রঞ্জনা সোমা হেসে ওঠে। অজয় এতক্ষনে ব্যপারটা সব বুঝতে পারে। পরেরদিন—রঞ্জনা দরজায় দাঁড়িয়ে অমর Duty চলে আসছে। কি করছেন? —মা সোমাদের বাড়ী গেছে। দেখছি আসছে কি, না। কাল মন্দির থেকে চলে এলেন কেন?

—না মানে আমার Duty'র সময় হয়ে গিয়েছিল তো—এমন সময় রঞ্জনাদের বাড়ীর গরুটা হঠাৎ ডেকে ওঠে—কি হল জল খাবি? অমর: হ্যাঁ, জল এক গ্লাস খেতাম। দিচ্ছি, দুটো সন্দেশ আর জল এনে অমরকে দেয়। এর আবার কি দরকার ছিল। আপনাকে দেখলেই তো মুখ মিষ্টি হয়ে যায়। অমর জল খেয়ে নেয়।

যাই, গরুটাকে আবার সন্দেশ দিতে হবে?

—কি বললেন গরু সন্দেশ খাবে। এই যা কি বলে ফেললাম। অমর Duty'র জন্য স্টেশনের পথ ধরে। কুসুমপুর স্টেশন—অমর রঞ্জনার কথা ভাবছিল একটা মালগাড়ী আসছে।

কাকাবাবু: অমর, চিঠিটা এসেছে। —অমর মায়ের চিঠিটা পড়ে।

মদের দোকান: দু' চারজন বসে মদ খাচ্ছে। অজয় প্রচুর মদ খেয়েছে।

দোকানের মালিক: অজয়বাবু অনেক রাত হয়েছে। দোকান বন্ধ করবো।

বাড়ী যান—অমরের বাড়ীর সামনে এসে দেখে তুতু দাঁড়িয়ে বলছে—তুমি ওরকম করে বল কেন তুতুও আসবে না, আমিও বাঁচবো না,—ও তো তোমার কাছে এসেছিল। তুমি-ই তার মনে আঘাত দিয়ে ফিরিয়ে দিয়েছ।

অজয়: না না আমি মন থেকে আঘাত দিই নি। ভুল বুঝনা আমায় তুমি—

তুতু : হ্যাঁ, তুমিই এর জন্য দায়ী। তার মনের দুঃখটা একবার বুঝবার চেষ্টা করেছিলে—চললাম। —আমায় ছেড়ে যেও না তুতু চীৎকার করে ওঠে।

অমর : মদের মাত্রাটা বেশী হয়েছে চল বাড়ী চল।

অমর Duty করে বাড়ী ফিরছিল—রঞ্জনা ছাদে কাপড় মেলছিল। দু'জনেই হাসে। পরে বাড়ীর পথ ধরে। অজয় ব্যাপারটা দেখেছিল।

অজয় : কোথায় ছিলে? আধঘণ্টা হ'ল দাঁড়িয়ে—দরকারী কাজটা রঞ্জনার ··

—তুই চিনিস্ রঞ্জনাকে। চিনি মানে ওর সঙ্গে আমার ভাইবোনের সম্বন্ধ—খুব ভাল মেয়ে। মা তোমাকে রাত্রে খেতে বলেছে—

—বাড়ীতে প্রায়ই লক্ষ্মীপুজো হয় রাত্রে আসছ তো? যাব। পরে —রঞ্জনা ভেতরে কাজ করছিল। মা বলে,—স্টেশনে গিয়ে সন্ধ্যের গাড়ীর খবরটা নিয়ে আসবার জন্য। তা না হলে সেবারের মত গাড়ী না পেয়ে ঘুরে ঘরে আসতে হবে।

—কিন্তু এখনও তো গোছগাছ বাকী আছে মা।

—গোছগাছ আমি করে নিচ্ছি। তুই গিয়ে গাড়ীর সময়টা নে। এদিকে অমর ষ্টেশনে জলের বালতী নিয়ে গাড়ীর অপেক্ষায় ছিল রঞ্জনাকে দেখে বলে কি ব্যপার এই সময়?

—মামার বাড়ী থেকে চিঠি এসেছে মামীমার খুব অসুখ তাই মা ও আমি সন্ধ্যের গাড়ীতে মামাব বাড়ী যাব। এতক্ষণে অমর সব কিছু বুঝতে পারে। মনটা খারাপ হয়ে যায় তবুও বিষণ্ণ হাসি।

—সন্ধ্যের গাড়ীটা ঠিক ছ'টায়। তোমার মামার বাড়ী কোথায়?

—কৃষ্ণপুর। দু' তিনদিনের মধ্যেই ফিরবো।

—তুমি তো জান রঞ্জনা দু' তিনদিন আমার কাছে দু' তিনবছর হয়ে ··

—তুমিও কি জান অমর কুসুমপুর থেকে শুধু আমার শরীর যাচ্ছে বাকী সব তোমার কাছে রয়ে যাচ্ছে। আমি যাই, মা ভাববে, সোমাদের বাড়ীতে সোমা জল তুলছিল। বাবা চা খাচ্ছিল। মা হাতে একটা চিঠি নিয়ে বেরিয়ে বলে উদয়পুর থেকে চিঠি এসেছে। লিখেছে পরশুদিন ওনারা তোমাকে দেখতে আসছে। ছেলের মাও ছেলে আসছে। ছেলের বাবার শরীর খারাপ—আসতে পারবে না।

—কালকে তা হলে তো আমার একবার কৃষ্ণপুর যেতে হয়। বাজারটা

ভাবছি ওখান থেকে করে নিয়ে আসবো। বাবা বাইরে চলে যায়। পরে কুসুমপুর হল্টে—কাকাবাবু একমাইল দূরে লাইন একটু গোলমাল হয়েছে। গাড়ী আসার আগে লাইন ঠিক করতে হবে—আমি ওখানে যাচ্ছি, তুমি স্টেশনে থেক—লাইনের মধ্যে ট্রলিতে করে চেপে কাকাবাবু চলে যায়। রঞ্জনা বাড়ী চলে এসেছে।

অমর : আজ পাঁচটায় স্টেশনে চলে এস—কথা আছে।

রঞ্জনা : ঠিক আছে, যাব। পরে রঞ্জনাদের বাড়ী—রঞ্জনা দোকানে জিনিষ আনতে গেছে। সোমার মা আসে। বলে হুগলীতে আমার একদূর সম্পর্কের দাদা থাকেন। বৌদি কিছুদিন হল মারা গেছেন। ওনাদের একটাই ছেলে—নাম অশোক। ছেলে হিসেবে খুব ভাল। দাদা এবার ছেলের বিয়ে দিতে চান তাই আমায় চিঠি লিখেছে—গ্রামে যদি কোন ভাল মেয়ের সন্ধান পাই তাহলে জানাতে। সেইজন্য বলি রঞ্জনার সঙ্গে যদি অশোকের বিয়ে দেন তাহলে কাল-ই আমি দাদাকে জানিয়ে দেব—

—মা তুমি তো সবই জান রঞ্জনা আমার একমাত্র মেয়ে কাজেই ওর মতামতটা তো একবার নেওয়া দরকার।

—আপনি বললে নিশ্চয় অরাজী হবে না। ছেলের বাবার বড় ব্যবসা—দাদার বয়স হওয়াতে অশোক সব দেখাশুনা করে—

—তাহলে আমি লিখে দেব আপনারা মেয়ে দেখতে আসুন।

—বেশ লিখে দাও। কুসুমপুর হল্ট বিকালবেলা। কাকাবাবু দু'চারবার কাশতে কাশতে অফিস থেকে বেরিয়ে আসে অমরকে বলে সেদিন যেখানে লাইন খারাপ হয়েছিল আজও ঠিক সেই জায়গায় খারাপ হয়েছে। আমার শরীর খারাপ—তুমি গিয়ে দেখে এস। লাইনের মধ্যে একটা ট্রলি দাঁড়িয়ে আছে। রঞ্জনা এসে পড়ে। কাকাবাবু দেখে বলে এদিকে শোন অমর। কি করতে এসেছ এখানে? —কাজ। ওকেও সঙ্গে নিয়ে নাও—দু'জনে ট্রলিতে চেপে যায়—যেখানে লাইন খারাপ হয়েছিল সেখানে ট্রলিটা এসে দাঁড়ায়। অমর যেখানে লাইন সারা হচ্ছিল অল্প হেসে সেখানে চলে যায়। খানিকক্ষণ বাদে ফিরে এলে রঞ্জনা বলে—আমার ভালবাসা তুমি কতদিন পর্য্যন্ত ধরে রাখতে পারবে? —দেখ রঞ্জনা ভগবানের এই পৃথিবীতে মরতে একদিন সবাইকে হবেই কাজেই মৃত্যুর পূর্ব মুহূর্ত পর্য্যন্ত কথা দিতে পারি—হবে তো?

—শুধু তুমি আমাকে ভালবাস—ব্যাস। এর বেশী কিছু চাইনা। পরে সন্ধ্যা হয়ে আসছে—কাজ শেষ করে ষ্টেশনে চলে আসে।

অজয় আসছিল—এই যে দিদিভাই কেমন আছিস্।

—কতবার আপনাকে বলেছি তুতুর জন্ত এসব ছাই ভস্ম খেয়ে জীবনটা নষ্ট করবেন না—কথা রেখেছেন?

—বিশ্বাস কর কর ওসব জিনিষ খাওয়া আমি কবে ছেড়ে দিয়েছি।

— সোমা আসে—সোমা মোটা বলে অজয় বলে এই যে বর্ষাকালের মাগুর মাছ—ভাল?

—দেখেছিস্ রঞ্জনা, দেখলেই বলে—

কুসুমপুর গ্রামে মদের দোকান হতে এক মাতাল মদ খেয়ে পথ হাঁটছে। আর একজন মদ খেয়ে রাস্তায় দাঁড়িয়ে আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকে—পূর্ণিমার চাঁদ উঠেছে—এই লোকটা এসে ওর দেখাদেখি আকাশের দিকে তাকায়। লোকটা বলে: গুরু আকাশের দিকে তাকিয়ে কি দেখছো? দ্বিতীয় ব্যক্তি: সূর্য্যটাকে দেখছিলাম কেমন স্পার্ক মারছে। প্রথমজন—ধ্যাৎ, ওটা সূর্য্য হবে কেন? ওটা চাঁদ—

দ্বিতীয় ব্যক্তি: তুই কি মাল টেনেছিস্ নাকি—ওটা কি চিনতে পারছিস্ না, ওটা হচ্ছে সূর্য্য—

—অঃ আমি মাল টেনেছি, আর তুমি বোধহয় জল খেয়েছো চাঁদু?

—আমি যে দোকান থেকে মাল খেয়ে বেরোলাম তুমিও তো সেই দোকান থেকে বেরলে—ওটা সূর্য। —না চাঁদ···তর্ক লেগে যায়। হঠাৎ কিছুদূরে এক ভদ্রলোককে আসতে দেখা যায় সেও পাঁড় মাতাল।

—এই যে দাদা, দেখুন তো ওটা কি—চাঁদ না সূর্য্য?

অনেকক্ষণ আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকে, বলে—ওটা কি আমি ভাই ঠিক বলতে পারব না কারণ আমি এ পাড়ায় থাকি না।

—দু'জনে হো-হো করে হেসে ওঠে।

কুসুমপুর গ্রামে একটা গাছের নীচে মোহন দু'চারটে লোক বসে খৈনী খাচ্ছিল—সোমার বাবা আসছিল—

মোহন: কাকা ও কাকা—এ গ্রামে কি হচ্ছে খবর রেখেছ?

—কি হল আবার এ গ্রামে?

—রাধাকৃষ্ণ কাকেবলে জান? ইষ্টিশনের কাকু আর রঞ্জনাকে চেন!

ব্যাস ইবার বুঝে নাও। আরে সবায় শুনেরে মিযাটো তাহলে খুব শীঘ্রী রেলগাড়ী চাপবে—সকলে হেসে ওঠে।

অমর ওর প্রাণের বন্ধু অশোককে চিঠি লিখছিল—এখানে এসে ভেবেছিলাম নিজেকে বোরিং লাগবে কিন্তু এখানে আমি দারুণ সুখেই আছি, একটা লাল গোলাপকে ভাল বেসেছি ·····

অশোক (হুগলীতে) নিজের বাড়ীতে বসে চিঠি দেখছে—মেয়েটা সত্যিই খুব ভাল। তিন চারদিন আলাপ হয়েছে, তিন চার বছরের ভালবাসা পেয়েছি। আমি ভেবেছিলাম আমাকে ভাল না বেসে আমার সম্পত্তিকে ভালবাসবে। কিন্তু ও আমার নাম ছাড়া আর কিছুই জানতে চায়নি। পারিস যদি তাহলে একবার চলে আয়। আর বিয়ের কাজ কিন্তু তোকেই করতে হবে—অমর। অশোক আনন্দে চিঠিটাকে দু'বার চুমু খেয়ে নেয়, 'দারুন মাল ফাঁসিয়েছিস্ বন্ধু'!

অশোকের বাবা : কুসুমপুর গ্রামে আমার দূর সম্পর্কের এক বোন থাকে। তোমার বিয়ের ব্যাপারে তাকে লিখেছিলাম—গ্রামে যদি ভাল মেয়ের সন্ধান পায় তাহলে জানাতে। কাল বোনের চিঠি পেলাম, একটা ভাল মেয়ের খোঁজ পেয়েছে—সঙ্গে একটা ফটো পাঠিয়েছে। ফটোটা দেখ—দেখে যদি তোমার পছন্দ হয় তাহলে আমায় জানাবে। অশোক রঞ্জনার ফটো দেখে—

গ্রামে মদ খেয়ে তালা খুলছিল এক ব্যক্তি। বাড়ীর দরজার তালা কিছুতেই খুলতে পারছে না। অন্য একজন লোক একে দেখতে পায়—মাল খেয়ে যে টলছিস্। তালার ফুটোতে চাবিটা ঠিক করে লাগা! —আমি মাল খেয়ে টলছি, না বাড়ীটা টলছে—তুই বাড়ীটাকে চেপে ধর, আমি তালাটা খুলে নি—লোকটা বাড়ীটাকে শক্ত করে চেপে ধরে, এ তালা খুলতে থাকে। এদিকে আকাশে প্রচণ্ড মেঘ, অমর ষ্টেশনে দাঁড়িয়ে আছে—এমন সময় রঞ্জনা আসে—তুমি এই দুর্যোগে? বৃষ্টি আরম্ভ হয়।

—বৃষ্টিতে ভিজতে আমার খুব ভাল লাগে, গান গেয়ে নাচতে থাকে। কুসুমপুর গ্রামে একটা গাছের নীচে রঞ্জনা সোমা দাঁড়িয়েছিল অমরের জন্য। ভাল করে আলাপ করার জন্য সোমা এগিয়ে যায়। বলে—কালকে গ্রামে কলকাতার নট্ট কোম্পানীর যাত্রা হবে। এদিকে হুগলীতে অশোক আসে। আজ আমি দারুণ খুশী কেন বলুন তো মা?

—নিশ্চয় কোথাও বিয়ের ঠিক হয়েছে তাই হয়ত············

—হ্যাঁ ঠিকই ধরেছেন, এই দেখুন মেয়েটার ফটো। হ্যাঁ অমরের একটা চিঠি এসেছে, লিখেছে এ গ্রামে একটা মেয়েকে ওর পছন্দ হয়েছে, শুধু আপনার মতামতের জন্য ও অপেক্ষা করছে।

—আমার আবার কি মত্। ওর যাকে পছন্দ হয়েছে ব্যাস—।
—correct আমারও ঐ মত্। আমি চিঠি না দেয়ে দেখতে যাব। ওখানে পৌঁছে ওকে আর বৌদিকে অবাক করে দেব—কেমন মজা হবে বলুন তো?

কুসুমপুর গ্রামে যাত্রাদল এসেছে। যাত্রা হচ্ছে সবাই এসেছে। সোমার মায়ের সঙ্গে রঞ্জনার মা বসেছে। অমর তাকায়। একসময় যাত্রা—ভেঙ্গে যায়। সোমার মায়ের সঙ্গে রঞ্জনার মা আসবে। রঞ্জনা আগে চলে আসে।

—আচ্ছা আবার কালকে দেখা হবে?

—কাল সকাল দশটায় ষ্টেশনে দেখা কর। রঞ্জনার মুখটা শুকিয়ে যায়
—সকাল দশটায় কেন?

—কাল সকাল দশটার গাড়ীতে আমি চলে যাচ্ছি। মায়ের না কি খুব অসুখ আজ সকালেই চিঠি পেলাম।

ঠিক এমন সময় ওর মা এসে দাঁড়ায়—দু'জনকে দেখে অমর মাথা নিচু করে। মা ভেতরে ঢুকে যায়।

—কতদিন আর এমনি করে চলবে রঞ্জনা? একদিন না একদিন সবকিছু মাকে জানাতেই হবে—ষ্টেশনে দেখা কর।

পরেরদিন রঞ্জনা টিফিন বাক্স নিয়ে অমরকে দেয়। গাড়ী ছাড়ার সময় হয়ে আসছে। মা সবকিছু জেনে ফেলেছে তোমাকে মায়ের সঙ্গে দেখা করে সবকিছু বলতে হবে।

—ঠিক আছে সাতদিন বাদে ফিরে এসে সব জানাব। ভালভাবে থাকবে।
—রঞ্জনার চোখে জল। কাকাবাবু রঞ্জনাকে দেখবেন।

—তোমার কোন চিন্তার কারণ নেই—চিঠি দেবে। বাই—রঞ্জনা কাকাবাবুর বুকে মুখ ঢাকে :—সান্ত্বনা দিতে থাকে। পরে মনের দুঃখে রঞ্জনা বাড়ীতে এসে শুয়ে পরে।

কুসুমপুর হল্ট—অশোক ট্রেন থেকে নামে। ট্রেন চলে যায়—কাকাবাবু ট্রেনকে সাইন দিতে থাকে। অশোক : নমস্কার। আপনি কি এখানকার incharge—হ্যাঁ কেন বলুন তো?

—এখানে আমার এক বন্ধু অমর চাকরী করে।

—ও আপনি ওর বন্ধু। এখানে কার কাছে উঠেছেন ?

—আমার এক পিসীমার বাড়ী আছে। ওনাদের কাছেই এসেছি।

রঞ্জনা মন খারাপ করে দরজায় দাঁড়িয়ে। সোমা আসে। অমরদা চলে গেছে ? —হ্যাঁ যাবার সময় তোর খোঁজ করছিল।

—বাবার একটা কাজে ভীনগ্রামে যেতে হয়েছিল। এমন সময় সোমা অশোককে দেখতে পায়—কবে এসেছেন ?

—হ্যাঁরে বাবার একটা দরকারি কাজ আছে বলে আসতে পারলেন না —বাব্বা কতদিন পরে এলেন ভাল আছেন তো ?

—হ্যাঁ ভাল, পিসীমা কেমন আছেন ?

—ভাল, বাড়ীতে চলুন। রঞ্জনাকে দেখে। রঞ্জনা মুখ নামিয়ে নেয়। আমার বান্ধবী রঞ্জনা। এমন সময় অজয় সুটকেস হাতে চলে আসছে।

—হন্তদন্ত হয়ে কোথায় চললেন ?

—কলকাতা যাব, গাড়ীর সময় হয়ে গেছে।

—ইনি হচ্ছেন আমার দাদা—অশোকদা—ইনিও দাদার ··

—এমন সময় পরিচয় হলযে আমি আর বেশিক্ষন দাঁড়াতে পারব না। ট্রেন প্রায় ষ্টেশনে এসে গেছে।

—ঠিক আছে, একদিন বেশ জমিয়ে আলাপ করা যাবে। পরেরদিন রঞ্জনা বাইরে দাঁড়িয়েছিল। পিওন আসছে—পিওনদাদা আমার চিঠি আছে। —না, পিওন চলে যায়। এদিকে অমরের ট্রেন দুর্ঘটনা হয়—বহু লোক জখম হয়—মারা যায়, অমর যে ট্রেনে যাচ্ছিল। প্রচণ্ড ভাবে আহত হয়। পরে গ্রামে—মেয়ে দেখতে অশোক রঞ্জনার বাড়ীতে বসেছে। রঞ্জনা চা নিয়ে আসে, পাশে বসে।

—আপনার কাছে একটা প্রার্থনা ছিল—যদি শোনেন।

রঞ্জনাঃ বলুন কি ব্যাপার।

—কালকের গাড়ীতে আমি চলে যাচ্ছি। ষ্টেশনে কি আপনার দেখা পাব ? —আপনি কালকে যাচ্ছেন আমাকে তো এমনিতেই ষ্টেশনে যেতে হবে কাল আমার এক বন্ধু আসছে। রঞ্জনা অশোক ষ্টেশনে আসে। রঞ্জনা ট্রেনের প্যাসেঞ্জারদের মধ্যে অমরকে খুঁজতে থাকে কিন্তু পায় না। মনে মনে আঘাত পায়। সোমা অমর—রঞ্জনার ব্যাপারটা অশোককে জানিয়ে দেয়।

অশোকের মনটা খারাপ ছিল। গাড়ী ছেড়ে দেয়। অশোক চলে যায়। রঞ্জনা উদাস দৃষ্টিতে কাকাবাবুর দিকে তাকায়।—অমর আসেনি বলে দুঃখ কি? হয়তো ট্রেন মিস্ করেছে। এদিকে অমরকে অপারেশনের জন্য হস্পিট্যালে নিয়ে আসে দু'জন ডাক্তার ও নার্স দাঁড়িয়ে আছে। রুগীর অনেক রক্ত বেরিয়েছে এখনই যদি operation না করা হয় তাহলে বাঁচানো মুস্কিল। অমরকে অপারেশন থিয়েটারে ঢুকিয়ে দেয়। পরে অমর আস্তে আস্তে চোখ মেলে তাকায়। বেডে শুয়েছিল।

—এটা কোন হাঁসপাতাল ডাঃ বাবু।

ডাক্তার: এটা কৃষ্ণপুর হাসপাতাল। মারাত্মক দুর্ঘটনা থেকে আপনি বেঁচে গেছেন।

—একি না না—একি করলেন? অমর কেঁদে ওঠে।

—সত্যিই আমি অসহায় আপনাকে বাঁচাতে গেলে এটার খানিকটা কেটে বাদ না দিলে—আপনার বাড়ীর ঠিকানাটা দিন।

এদিকে রঞ্জনা মনের দুঃখে রেল লাইনের ধারে এসে বসে। আগেকার স্মৃতিগুলো চোখের সামনে ভাসতে থাকে।

মনে প্রচণ্ড আঘাত পায়! আবার স্টেশনে এসে গাড়ীর মধ্যে অমরকে খুঁজতে থাকে পায় না। চোখ দিয়ে জল পড়তে থাকে।

কাকাবাবু: রঞ্জনা প্রায়ই দেখছি তোমায় এখানে চলে আস?

রঞ্জনা: যতদিন না ওর দেখা পাই এখানে খুঁজবো?

হুগলীতে অমরের বাড়ী অশোক আসে।

—মেয়ে দেখে কবে ফিরলে?—কালকে ফিরেছি। অমর কোথায়?

—ও হাসপাতালে। ওর চিঠি পেলাম বাড়ী আসছিল কৃষ্ণপুর ষ্টেশনে কিছু কিনবে বলে নামতে গিয়ে পা ফসকে লাইনে পড়ে যায়-পায়ে নাকি আঘাত লাগে সেইজন্য বেশ কিছুদিন বাড়ী আসতে পারবে না।

এদিকে রঞ্জনা প্যাসেঞ্জার গাড়ীর বাঁশীর শব্দ শুনে বাড়ী থেকে বেরিয়ে ষ্টেশনের পথ ধরে। সোমা: রঞ্জনা নেই?

—প্রায়ই তো ও চলে যায়। কত বারন করেছি কিন্তু ওকি শুনবে তুমি একটু বুঝিয়ে বল—এক্ষুনী যদি কোন বিপদ করে বসে।

—ঠিক আছে আমি বুঝিয়ে বলব।

অমরকে ডাক্তাররা ট্যাক্সীতে চাপিয়ে দেয়—অমর বাড়ী আসে।

—তোর পা ঠিক আছে খোকা? মায়ের কথা কি ভুলে গেস্লি!

—না মা, তোমার কথা আমি সব সময় চিন্তা করতাম। লাইনের মধ্যে পড়ে গিয়ে পায়ে আঘাত লাগার সময় তোমার কথা মনে…

—তুই বস্ পায়ে তেল মা'লিশ করে দিচ্ছি। দেখবি ভাল হয়ে যাবে।

—মালিশ করতে হবে না। দুদিনের মধ্যে ভাল হয়ে যাবে।

—আমি তোর জন্য দুধ গরম করে আনছি। এমন সময় অশোক শুনলাম তোর নাকি কুসুমপুর গ্রামে বিয়ের ঠিক হয়েছে। আবার চুপি চুপি মেয়েও দেখে এলি।

—এই মেয়েটার ফটো চিনিস?—কই না তো?

—হ্যাঁ, চিনিস তুই। কিন্তু এখন না চেনবার ভান করছিস্।

—না, না অমর এমন কথা বলিস না। আমি কি জানতাম! তখন সোমা আমাকে সব বলেছে। এতদিন ভালবেসে আজ ওকে চিনতে পারছিস না—কিন্তু কেন?

—এর উত্তর আমি দিতে পারব না বন্ধু।

—বাঃ এদিকে বন্ধু বলছিস্ ওদিকে উত্তর দিতে পারবি না। তোর দিব্যি অন্য কোন ছেলে যদি ওর পথে আসতে চায়-তাকে আমি খুন করে ফেলবো বল্ বন্ধু, বল?

অমরের চোখে জল ও ভগবান আমি যে তোকে কিভাবে বোঝাবো আমি নিজেই বুঝতে পারছি না।

—দেখ্ অমর আজ হয় তোকে সত্যি কথা বলতে হবে তা না হলে চির দিনের মত বন্ধুত্ব এইখানেই শেষ।

এদিকে মা দুধ গরম নিয়ে এসে দরজায় দাঁড়ায়—

এরা দু'জনে মাকে দেখেনি—অমর পায়ের জুতোটা খুলতেই কাটা পা দেখতে পায়-কিছুটা পা কাটা

—মা দেখে প্রচণ্ড জোরে চীৎকার করে ওঠে দুধ পড়ে যায়। অমর মা বলে গিয়ে কোনরকমে ধরে নেয় মা জ্ঞান হারায়। দুজনে মাকে ধরাধরি করে বিছানায় শুইয়ে দেয়—অশোকের চোখে জল।—দেখেছিস অশোক মা এক-বার দেখে সহ্য করতে পারল না। তো রঞ্জনা কি করে সহ্য করবে। তাকে আমার সঙ্গে সারাজীবন থাকতে হবে। সেইজন্য ওর কাছ থেকে আমি দূরে থাকতে চাই। ওর অন্য কোথাও বিয়ে হয়ে গেলে সুখে থাকবে—আমি এই

পা নিয়ে কোনদিন ওকে সুখী করতে পারব না, তোর কাছে আমার অনুরোধ তুই ওকে বিয়ে করে নে—

—অমর তাহলে তুই বলতে চাস্ দুটো জীবন শেষ করেছি—এক বন্ধু চিতার আগুনে জ্বলবে আর অপর বন্ধু বিয়ে করে সুখে সংসার করবে? তোর কাছে হাত জোড় করছি তুই ওকে বিয়ে করে নে—একবন্ধু আর এক বন্ধুর উপকার করে কিনা?

—করে অমর করে এই উপকারটা তুই না করে আমি যদি করি এটাও জেনে রাখ ব্যাপারটা জানার পর আমি বাবাকে এসে বলে দিয়েছি ওখানে বিয়ে করবনা।

—আমি ভাবছি কুসুমপুর থেকে Transfer নিয়ে নেব।

—যা ভাল বুঝিস্ তাই কর।

রঞ্জনা অমরের একটা ফটো নিয়ে বিছানায় শুয়ে কাঁদছিল। সোমা বলে আর কত দিন এভাবে কাঁদবি যে তোকে এমনিভাবে আঘাত দিয়ে চলে গেল তার কথা কত ভাববি। ধোকা দিয়েছে।

—আমিও ঠিক এই কথাটাই বুঝতে পারছি না।

সেও কেন এমন করল? আমার মনের অবস্থা খুবই খারাপ। কেবলি মনে হচ্ছে ওর সঙ্গে কথা বলি-ওকি জানে কুসুমপুর গ্রামে একটা অভাগা মেয়ে কেঁদে বেড়াচ্ছে। ও বোধ হয় বেশ সুখেই দিন কাটাচ্ছে।

—তোর দুঃখ সবই আমি বুঝি কিন্তু কি করব বল্ তুই বরং অশোকদাকে বিয়ে করে নে অশোকদা ছেলে হিসাবে—

—আমার জীবনে শুধু একজন-'অমর'।

এদিকে অমর উদাস মনে বাড়ীতে বসে আছে।

রঞ্জনা অমরের বাড়ী হুগলী যাবে। ট্রেনে উঠে পড়ে।

অমর : অশোক আমি Rly Head office-এ গিয়েছিলাম এবং কুসুমপুর থেকে Transfer নিয়ে নিলাম।

অশোক : তুই কি ভেবেছিস্ ট্রান্সফার নিলেই বুঝি রঞ্জনা তোকে ভুলে যাবে?—জানি তবুও দূরে থাকতে চাই। যদি কোনদিন রঞ্জনা এসে আমার ঠিকানা জানতে চায়—বলিস না—চণ্ডীপুরে ট্রান্সফার নিয়েছি।

অমর ট্রেন থেকে চণ্ডীপুর হল্টে নামে। এখানেও একজন Incharge আছেন - কাকাবাবু বলে তাকে, জলের বালতী নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

চণ্ডীপুরের আগের স্টেশন রতনপুর। এখানকার Incharge এর সঙ্গে রতনপুরের Incharge এর বন্ধুত্ব—

—আরে মিঃ পালিত তারপর কি মনে করে?

মিঃ পালিত ব্যাপারটা গোপনীয়। অফিসে চল বলছি। অমর ওদের নমস্কার জানায়।

পরে রঞ্জনা অশোকের বাড়ীতে আসে। অশোককে বলে আপনার বন্ধুর বাড়ী গিয়েছিলাম কাউকেই দেখতে পেলাম না। কোথায় গেছে বলতে পারেন?

—মা তীর্থে গেছেন। অমর চণ্ডীপুর ট্রান্সফার নিয়ে চলে গেছে। রঞ্জনা ট্রেনে চেপে পড়ে—ট্রেন চলতে থাকে। রতনপুর স্টেশনে জল খাবে বলে নামতে গিবে পা ফস্‌কে প্লাটফর্মের উপর পড়ে যায়—মাথায় আঘাত লাগে। দু' একজন লোক গেল গেল করতে থাকে।

Incharge ছুটে আসে সকলে ধরাধরি করে অফিসের মধ্যে নিয়ে যায়।

এদিকে অমর দাঁড়িয়েছিল এমন সময় গাড়ী থেকে সোমা নামে- অমরদা ছিঃ ছিঃ আপনি যে এত স্বার্থপর তা আগে জানতাম না বলতে পারেন আমার বান্ধবী আপনার কাছে কি দোষ করেছিল? আপনার জন্য শুধু ওকে ওর মাকে কত দুঃখ সহ্য করতে হয়েছে জানেন।

—না মানে, আমি ঠিক তোমাকে বোঝাতে···

—থাক্ আর বুঝিয়ে দরকার নেই, ধন্যবাদ। সোমা চলে যায়। রঞ্জনা অমরকে খুঁজতে থাকে পায় না। পূর্বের স্মৃতি ভেসে ওঠে।

—ভাবছি তোর অসুস্থ শরীর সেরে গেলে গ্রামে দিয়ে আসবো। চণ্ডীপুরের বাকাবাবু: অমর এই চিঠিটা রতনপুরের 'nchargeকে দিয়ে এস। খুব Urgent চিঠি। আর যদি আমার কথা জিজ্ঞাসা করে বলবে ভাল আছি। অমর ট্রেনে চেপে রতনপুর চলে যায়। রঞ্জনা দাঁড়িয়ে আছে। দু'দিক থেকে দুটো ট্রেন এসে দাঁড়ায়—অমর হাতে একটি ছড়ী নিয়ে খোঁড়াতে খোঁড়াতে এসে চিঠিটা দেয়। এমন সময় ট্রেনের বাঁশী পরে যায়—অমর যেই গাড়ী ধরবে অমনি রঞ্জনা অমর বলে ডেকে ওঠে—দৌড়ে এসে মুখটাকে নিজের দিকে ঘুরিয়ে নেয়। অমর চুপ করে ওর দিকে তাকিয়ে থাকে। রঞ্জনা বলে এমন ভাবে দেখছো যেন আমায় চেনই না।

—মাফ্ করবেন আমি আপনাকে ঠিক চিনতে পারলাম না।

—কি বলছ তুমি, আমি রঞ্জনা, ভাল করে দেখ তোমার রঞ্জনা—

—আপনার বোধ হয় চিনতে ভুল হয়েছে।

রঞ্জনার চোখে জল। না আমার চিনতে ভুল হয় নি, তুমিই না চেনবার ভাণ করছ ও হো তোমাকে আমি কি করে বোঝাবে আমি-ই রঞ্জনা। তোমার মনে পরে ট্রলিতে ঘুরতে যেতাম, Duty থেকে ফেরার সময় দরজার দাঁড়িয়ে থাকতাম –

—কেন আমার সঙ্গে মজা করছেন। আমি সে নই।

ট্রেন চলতে থাকে। অমর খোঁড়াতে খোঁড়াতে গিয়ে ট্রেনের হ্যাণ্ডেলটা ধরে। রঞ্জনা কাকাবাবুকে বলে আপনাকে যার কথা বলেছিলাম সেই অমর। ওকে আটকান কাকাবাবু।

—যে তোকে নিজেই চিনতে পারল না তাকে আটকিয়ে কি লাভ। পরেরদিন প্যাসেঞ্জার গাড়ী এসে দাঁড়ায়। রঞ্জনা গাড়ী থেকে নেমে পাশে দাঁড়ায়। অমর রঞ্জনার কথা ভাবছিল। আর কিছুক্ষণের মধ্যেই একখানা মালগাড়ী আসবে স্টপেজ নেই—প্রচণ্ড স্পীডে ছুটে আসছে।

কাকাবাবু: এভাবে নিজের মনকে কষ্ট দিয়ে কি লাভ হচ্ছে অমর। কালকে রঞ্জনাকে ফিরিয়ে দিয়ে ভাল করনি। রঞ্জনা খানিকটা দূরে দাঁড়িয়ে থেকে এদের কথাবার্ত্তা শুনতে থাকে। এরা রঞ্জনাকে দেখেনি। অমর: আপনি তো জানেনই ট্রেন দুর্ঘটনায় হস্পিট্যালে আমার পা কিছুটা কেটে বাদ দেওয়া হয় এখন বলুন এই পা নিয়ে ওকে কি কোনদিন সুখী করতে পারব? আমি আমার হারিয়ে যাওয়া ভালবাসা নিয়ে বেঁচে থাকতে পারবো কিন্তু ওর বোঝা হয়ে থাকতে পারব না।

রঞ্জনা: কার ভালবাসা নিয়ে তুমি বেঁচে থাকতে চাও? কাল যাকে চিনতে পারনি? তুমি-ই বলতে শরীর থাকবে না কিন্তু ভালবাসা থেকে যাবে। আর আজ তোমার কাছে শরীরই বড় হয়ে গেল। সামান্য পা চলে যাওয়াতে ভালবাসা চলে গেল? অমরের চোখ ঝাপ্‌সা, রঞ্জনা।

—একটা অজানা অচেনা মেয়ে তোমার সম্বন্ধে কিছু না জেনে জীবন পর্য্যন্ত দিয়েছিল আর আজ তাকে তুমি এমনি ভাবে ফিরিয়ে দিলে? এমন সময় প্রচণ্ড স্পীডে মালগাড়ী ছুটে আসছে—কাকাবাবু পতাকা নিয়ে গাড়ীর সাইন দেবার জন্য দাঁড়িয়ে আছে—দু'জনের চোখেই জল।

—ঠিক আছে শরীর থাকে না থাক্ ভালবাসা চিরদিন থাকে দেখো তাহলে কথাটা বলেই রঞ্জনা লাইনের মধ্যে নেমে ছুটতে থাকে। গাড়ী কিন্তু স্টেশন থেকে বেশী দূরে নয়—

—রঞ্জনা রঞ্জনা বলে যেতে গিয়ে ওখানেই হোঁচট খেয়ে পরে যায়—হাতের ছড়ীটা লাইনের মধ্যে ছিটকে পরে অমর প্লাটফর্মে পড়ে যায়। ছড়ীটাকে আনতে গেলে রঞ্জনাকে বাঁচানো যাবে না। রঞ্জনা কোন দিকে না তাকিয়ে লাইন ধরে সোজা ছুটতে থাকে। কাকাবাবু বলে অমর শীঘ্র যাও। রঞ্জনাকে বাঁচাও। অমর লাইনের মধ্যে নেমে পরে—খোঁড়া বলে ঠিকমত যেতে পারছে না—লাইনের মধ্যে পড়ে যাচ্ছে দু' এক জায়গায় কেটে যাচ্ছে এদিকে রঞ্জনা এক জায়গায় গিয়ে থেমে পড়ে গাড়ী পীছে আসতে থাকে—রঞ্জনা পায়ের খানিকটা অংশ লাইনের মধ্যে রেখে চোখ বুজে পাশে বসে থাকে।

—রঞ্জনা, বলেই অমর একটানে কোলের মধ্যে টেনে নেয় রঞ্জনাকে—সঙ্গে সঙ্গেই মালগাড়ী বেরিয়ে চলে যায়—লাইনগুলো কাঁপতে থাকে।

অমর, এ কি করছিলে? এ কি হচ্ছিল?

—কিছুই নয়—তোমার মতই হয়ে যেতাম! যাতে আমাদের মধ্যে কোনো পার্থক্য না থাকে।

—আমাকে ক্ষমা করে দাও রঞ্জনা।

—রঞ্জনাকে অমর আলিঙ্গন করে, কাকা বাবু দেখে। পরের দিন রঞ্জনা দাঁড়িয়ে আছে।

অমরের মা - অশোক এসে নামে চণ্ডীপুর স্টেশনে। মা : খোকা! অমর। মা : অশোক : অমরের মা। কাকাবাবু : নমস্কার। মা রঞ্জনার দিকে তাকিয়ে দেখ্‌তো। তোর জন্য ওকে কতখানি কষ্ট পেতে হয়েছে। আমার কাছে আয়—রঞ্জনা আমি আশীর্বাদ করছি তোমরা যেন সুখে থেক। সবাই অল্প হাসে। অশোকের চোখে আনন্দাশ্রু—পরে গাঁয়ের পথে দু'জন চলে যাচ্ছে। হঠাৎ দাঁড়িয়ে যায়—অল্প হেসে আবার পথ চলতে থাকে।

সমাপ্ত

"অরিজিনাল"

দক্ষিণ ভারতের একটি স্থান কেরালা। পূর্বে গ্রাম নামে পরিচিত থাকলেও বর্তমানে কেরালা শহর নামের যোগ্যতা অর্জন করেছে। শহরটি বহুদিনের পুরাতন। শহরটি ছোট হলেও জনবসতি অত্যাধিক বেশী। শহরটির চারিদিক বেষ্টন করে রয়েছে বড় বড় নারিকেল, তাল, দারচিনি, তেজপাতা ইত্যাদি গাছ।

লবনাক্ত মাটি হওয়ায় এখানে নারিকেলের ফলন প্রচুর পরিমাণে। চারিদিক বেষ্টন করে রহিয়াছে অসীম জলরাশি—সমুদ্র।

সমুদ্রের জলরাশি তোলপাড় করিয়া এক একটি ঢেউ আসিয়া "সমুদ্র তীরে" আছড়াইয়া পরিতেছে। কেরালা শহর হইতে "ত্রিবান্দ্রম" খুব বেশী দূর নহে। দক্ষিণ ভারতে বেশকিছু তীর্থস্থান, জু-গার্ডেন, আর্ট গ্যালারী, তিরুপতি মন্দির, রামেশ্বরম দেব-দেবীর মন্দির, কন্যাকুমারী দেবীর মন্দির তৎসহ বিবেকানন্দ শিলা ইত্যাদি প্রচুর পরিমাণে তীর্থস্থান বর্তমান।

ত্রিবান্দ্রম হইতে মোটামুটি দূরত্বে কন্যাকুমারিকা অবস্থিত। সমুদ্রের ধারে ভারি চমৎকার জায়গা। কন্যাকুমারীদেবীর মন্দির মাথা উঁচু করে দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। দেবীর মূর্ত্তি মন্দিরের ভেতর পাথরের গুহায় অবস্থিত। এছাড়া বিবেকানন্দ শিলা বা রক, গান্ধীজীর মন্দির ইত্যাদি দেখতে পাওয়া যায়।

কন্যাকুমারী দেবীর সম্বন্ধে ছোট কাহিনী শোনা যায়। কথিত আছে, যখন দেবী কন্যাকুমারীর বিবাহের সময় উপস্থিত হয়, তখন শিব বিবাহ করিবার উদ্দেশ্যে বরযাত্রীরূপী অসংখ্য ভূত-প্রেত লইয়া কন্যাকুমারীর উদ্দেশ্যে যাত্রা শুরু করেন। কিন্তু পথে দেরী হয়ে যাওয়ায় এবং বিবাহের লগ্ন পেরিয়ে যাওয়ায় কন্যাকুমারীর আর বিবাহ হয় না। তিনি তখন মা চণ্ডীর পূজা আরাম্ভ করেন এবং চণ্ডীদেবী সন্তুষ্ট হইয়া তাঁকে বরদান করেন। তখন কন্যাকুমারী প্রস্তর মূর্ত্তি ধারণ করেন। বিবাহের সমস্ত খাদ্যসামগ্রী অংসখ্যক বালিরূপে চারিদিক পরিপূর্ণ হয়। আরও কথিত রহিয়াছে যে, রামচন্দ্র, লক্ষণ, সীতা এবং হনুমানগণ প্রথমে কন্যাকুমারীতে

আসেন। রামচন্দ্র কন্যাকুমারীর পূজা করেন। তখন দেবী কুমারী সন্তুষ্ট হয়ে তাঁদের সকলকে রামেশ্বর যেতে বলেন এবং রামেশ্বরে সমুদ্রের নিকটবর্ত্তীস্থানে "শিব-পূজা" করিতে আদেশ দেন।

তখন রামচন্দ্র এবং সকলে মিলে পায়ে হেঁটে সমুদ্র ধারে পৌঁছন এবং সেখান হইতে "সেতুবন্ধন" করিয়া রামেশ্বরম্ পৌছন। বর্তমানে ঐ জায়গা রামেশ্বরম্ বা রামেশ্বর নামে অভিহিত। এখানে রামচন্দ্রের বড বড় পাথরের কারকার্য্য মূর্ত্তি এবং মন্দির রহিয়াছে। কন্যাকুমারীতে দেখিবার জিনিষ বিবেকানন্দ শিলা বা রক উল্লেখযোগ্য। এখানে স্বামী বিবেকানন্দ সাধনা করিয়া অমরত্ব লাভ করেন। স্বামী বিবেকানন্দ যে পাথরের উপর ধ্যানমগ্ন অবস্থায় দিন কাটাতেন তাহা এখনও বর্তমান রহিয়াছে। বিবেকানন্দ শিলা বা রকের মধ্যে স্বামী বিবেকানন্দের ব্রোঞ্জের মূর্ত্তি, রামকৃষ্ণদেব ও সারদাদেবীর ছবি এবং কন্যাকুমারীদেবীর "পায়ের ছাপ" রহিয়াছে। বিবেকানন্দ রক জায়গাটি অপূর্ব সুন্দর এককথায় চমৎকার। চারিদিকে অসংখ্য জলরাশি সমুদ্রের গর্জ্জন এবং বড় বড় ঢেউ আছড়ে পডছে রকের উপর। রকটি উঁচু জায়গায় অবস্থিত বলে জলরাশি বাধা খাইয়া পুনরায় ফিরিয়া যাইতেছে। সমুদ্র জলের ভিতর নানারকম অগুণতি মৎস্য তাদের রঙীন পাখ্না এবং গুচ্ছ মেলিয়া ভাসিয়া বেড়াইতেছে সে এক চমৎকার দৃশ্য। এছাড়া সান্‌রাইজ এবং সান্‌সেট এক অপূর্ব দৃশ্য।

এছাড়া Kovalm Sea-beach, নানা দেবদেবীর মূর্ত্তি প্রস্তরে খোদাই করা রহিয়াছে। ত্রিবান্দ্রম হইতে বাসে করিয়া ত্রিঞ্চুর নামক স্থান হইতে কেরালায় প্রবেশ করিতে হয়। ওখান হইতে এর্ণাকুলম, কোচিন-সুন্দর ও বাস্তু বন্দর। সেখানকার প্রাকৃতিক সৌন্দর্য অপূর্ব। এছাড়া উল্লেখযোগ্য স্থান কোট্টয়াম—সবুজ-নীলে অপূর্ব্ব সমন্বয় ঘটেছে—এখানে প্রচুর পরিমাণে নারিকেল, ট্যাপিয়েগা, কাজুবাদাম, রবার, এলাচ লবঙ্গের গাছ রহিয়াছে। গাছপালায় ঐশ্বর্য্যে গর্বিত আকাশছোঁয়া পর্বতচূড়া। প্রদেশটির মধ্যে মধ্যে তীরভূমিকে কেটে কেটে আরব সাগরের জল অনেকটা

ভিতরে প্রবেশ করেছে। এগুলি হলো, Back Wators, কেরালার সৌন্দর্য্য বৃদ্ধিতে এদের ভূমিকা অনন্য। এছাড়া রাস্তাঘাট পরিষ্কার, শহর ছিমছাম সাজানো—অতীবসুন্দর সে সব দৃশ্য মন ক্যামেরায় বন্দী করে রাখার মতো সুন্দর। এছাড়া পাহাড়ী অঞ্চল "থিকাড়ী" নামে একটি জায়গা অবস্থিত। 'এই যাত্রাপথ যে রকম পর্বত সঙ্কুল, তেমনি ভয়ানক।' একপাশে খাড়া উঁচু পাহাড় উপরে অসীম শূন্যে হারিয়ে গেছে। অন্যপাশে অতলান্ত খাদ। নিম্নে তাকালে দেখা যায় অন্ধকার, কুয়াশা আর ঘনবনের সহাবস্থান। কোথাও বা দূরে পাহাড়ের গায়ে কার্পেটের মত বিস্তৃত কফির বাগান। সারাটা পথে চৌদ্দ-পনের মাইল অন্তর দু' একটা ছোট্ট খাবার দোকান যেমন ইড্‌লি, সম্বরম্‌ তৎসঙ্গে দহিবড়া, দোসা মশলা দেওয়া, ডিমের নানারকম Preparsation এবং চমৎকার কফি। একদফা টিফিনের পর বাসে করে থিকাড়িতে যাইলে দেখা যায় পাহাড় চুড়াগুলির মাথায় "মেঘের মুকুট পড়ানো।" কোথায় বা মেঘের স্তূপ পাহাড়ের গায়ে গড়িয়ে নামিতেছে (৪০-৫০টি) পাহাড় ডিঙিয়ে "থিকাড়ি"তে পৌঁছতে হয়। এখানে মোটরলঞ্চে করে পাহাড়ী পরিবেশে ঘুরতে ভালো লাগে। নিঃসন্দেহে গভীরতম রোমাঞ্চকর ও আনন্দময় পরিবেশ। এখানে শারিবদ্ধ হস্তিরদল, হরিণ-হরিণী এবং পেখম তুলে ময়ুর-ময়ুরীর নৃত্য অপূর্ব পরিবেশ সৃষ্টি করেছে। লঞ্চে করে প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য দেখতে দেখতে বিস্ময়ে হতবাক্‌ হয়ে যেতে হয়।

যাক্‌, আসল কথায় আসা যাক্‌। দক্ষিণ ভারতের কেরালা নামের শহরটির নানা ঘটনা ও ইতিহাস বহুদিন হইতেই চাপা পড়িয়া রহিয়াছে। তারই একটি অংশ আলোচনা করিলে তাদের সাংসারিক জীবনের দিকগুলি কি রকম অর্থাৎ তাঁহাদের সাধারণ জীবনে কি কি ঘটনা ঘটিয়াছে বা বর্ত্তমানেও ঘটিতেছে তাহার কিছু অংশবিশেষ আপনাদের সম্মুখে তুলে ধরছি। তাদের জীবনের সমস্ত ঘটনা আলোচনা করিতে গেলে সে এক বিরাট উপন্যাস হয়ে যাবে—আমি সংক্ষেপে ঘটনাটি বর্ণনা করছি,

ঘটনাটি নিম্নরূপ ঃ

ছোট্ট একটি পরিবার—মা, বাবা ও দুই ছেলেমেয়ে নিয়েই তাদের সংসার। বাবা জনার্দন গণেশন্ সামান্য একটি অফিসের কেরাণী। মা, জানকীদেবী দেবীর ন্যায় মহিলা। ছেলে সন্দীপন্ এবং মেয়ে শবরী—এই নিয়েই পরিবার।

সন্দীপন্ এবং শবরী দুজনেই কলেজে পড়াশুনা করছে। তাঁদের বাবা জনার্দনবাবু ছিলেন সৎকর্মে বিশ্বাসী। তিনি কোনদিন অন্যায়কে প্রশ্রয় দিতেন না। ন্যায়ই ছিল তাঁর শ্রেষ্ঠ ধর্ম। অফিসের বেশকিছু লোক তাঁর সঙ্গে প্রত্যহ ঝগড়া-কথাকাটাটি করত। —চুরি, কর্তব্যে ফাঁকি দেওয়া ইত্যাদির জন্য সন্দীপনের বাবার সঙ্গে প্রায়ই অফিসের বেশকিছু বচসা বেঁধে যেত। মাঝে মধ্যে ঝগড়া এমনরূপ নিত যে তাঁর বাবা লোকটিকে একা রাস্তায় পেলে দেখে নেবে এবং লোকটিও ঠিক অনুরূপ বলিত।

একদিন সন্দীপনের বাবা ব্যাঙ্ক হইতে তাঁর জমানো হাজার পাঁচেক টাকা লইয়া আসিতেছিল—ঠিক তখনই কয়েকজন গুণ্ডা-মার্কা ব্যক্তি থলি ভর্ত্তি পাঁচহাজার টাকা লইয়া পালাইল। জনার্দন বাবু প্রচণ্ড আঘাত পেলেন অতগুলো টাকা চুরি হওয়াতে—খুবই মুষড়ে পড়লেন। যাইহোক পুনরায় তিনি অফিসের কাজে মনোনিবেশ করলেন। তিনি বুঝতে পারলেন না যে অফিসের লোকেরাই গুণ্ডা লাগিয়ে পাঁচহাজার টাকা আত্মসাৎ করেছে। অফিসের বেশকিছু ব্যক্তি এতেও সন্তুষ্ট নয় তাঁরা চায় জনার্দন বাবুকে পৃথিবী থেকে সরিয়ে দিতে। কারন তিনি সরে গেলে পথের কাঁটা দূর হবে—অফিসের টাকা জিনিষপত্র চুরি করিতে সুবিধা হবে সেইজন্য আর কি! সুযোগ এসে গেলো এবং তাঁর সদব্যবহার করতে লোকটি ভুল করলো না। অফিসের বেশকিছু লোকের মধ্যে একটি লোককে জনার্দনবাবু হাতেনাতে ধরে ফেলে অপমান করেছিলেন সেই ব্যক্তি বদলা নেবে খুন করবে ঠিক করলো। অফিসের কাজে একদিন জনার্দনবাবুকে বোম্বে যেতে হলো। বোম্বে রওনা হওয়ার দিনই অফিসের সেই লোকটি বেশ মিষ্টি করে জনার্দন বাবুকে বলল চলুন আপনাকে ট্যাক্সী করে ষ্টেশনে পৌঁছে দিয়ে আসি।

লোকটি সঙ্গে দু'জন গুণ্ডা নিতে ভুল করলো না। জনার্দনবাবু কিছুই বুঝতে পারলেন না।

যাইহোক, ট্যাক্সী করে ষ্টেশনের উদ্দেশ্যে তখন তাঁরা রওনা হলেন তখন লোকটি আকস্মিকভাবে ট্যাক্সীর মধ্যেই জনার্দনবাবুর গলায় একটি রশির ফাঁস টেনে পেঁচিয়ে ছাড়িল এবং অপর একটি গুণ্ডা ততক্ষণে জনার্দনবাবুর বুকে ও পিঠে ছুঁরি বসিয়ে দিয়েছে। জনার্দনবাবু বলির পাঁঠার মতো ছট্‌ফট্ করিতে করিতে এলাইয়া পড়িলেন। তখন গুণ্ডা দুটি একটি বড় বস্তায় পুড়িয়া মুখটি ভাল করে বাঁধিয়া সমুদ্রের নিকট লইয়া গেল—তারপর বস্তা সমেত সমুদ্র জলে নিক্ষেপ করিল। ট্যাক্সীসমেত তৎক্ষণাৎ সেইস্থান ত্যাগ করিয়া তাহারা চলিয়া গেলো। এই সংবাদ তাহারা ছাড়া কেহই জানিতে পারিল না। দশদিন অতিবাহিত হয়ে গেলো কিন্তু জনার্দনবাবু ফিরিলেন না তখন জানকিদেবী চিন্তায় ভাঙ্গিয়া পড়িলেন কিন্তু কেহই তাঁর সংবাদ দিতে পারলোনা। জানকিদেবী অনুমান করিলেন যে এমন একটি জলজ্যান্ত মানুষ নিখোঁজ হলো কিন্তু কারও মাথা ঘামাবার বা কোন চেষ্টা করার ইচ্ছাই নেই।

এদিকে কলেজে পড়িবার প্রাক্কালে সন্দীপন চাকরীর চেষ্টা করছিল এবং বহু ইন্টারভিউ পেয়ে শেষে একদিন চাকরী পেলো—সরকারী চাকরী মোটামুটি চলিয়া যাইতো। কিন্তু সন্দীপন বুঝিতে পারিল না যে তাঁর বাবা কোথায় গেলেন না কি স্বয়ং ঈশ্বর পৃথিবী হইতে তাঁকে সরিয়ে নিলেন।

এদিকে অফিসের বদ্‌মাইস লোকটি এবং বেশকিছু লোক জনার্দনবাবুকে মেরে শান্তি পাইনি তাঁরা সংসারটিকে ধুলিসাৎ করিয়া দিতে চায়। একদিন রাত্রে জনার্দনবাবুর অফিসের সেই বদ্‌মাইস লোকটি দু'জন গুণ্ডাসমেত পুনরায় হাজির হলো সন্দীপনের বাড়ীর সম্মুখে। পাঁচিল টপকাইয়া ভিতরে প্রবেশ করে ঘুমের ঔষধ প্রয়োগ করিল সন্দীপন, জানকিদেবী এবং শর্বরীর উপর—সকলে গভীর ঘুমে এলাইয়া পড়লেন। সিন্দুক হইতে গয়নাগাটি এবং টাকা পয়সা লইয়া শর্বরীর নিকট আসিল। তারপর শর্বরীকে

পাঁজা কোলা করিয়া বদমাইস লোকটি বাহিরে লইয়া আসিল। বাইরে তাদের জন্য ট্যাক্সী ছিল কোন অসুবিধা হয়নি। কিন্তু যাবার পূর্বে ভুল করিল না সন্দীপনের মুখে কাপড় চাপিয়া পিঠে ও বুকে ছুরি মারিয়া সকলে মিলে ট্যাক্সী চাপিয়া পালাইল।

ট্যাক্সী আসিয়া থামিল একটি গুণ্ডার আড্ডায়। শর্বরীকে একটি ঘরের মধ্যে বন্দী করিয়া রাখিল। বেশ কিছুক্ষণ পরে শর্বরার জ্ঞান ফিরিলে সে বুঝলো একটি ঘরের মধ্যে বন্দী। গা-হাত প্রচণ্ড বেদনা অনুভব করিল। গতকাল রাত্রির কথা স্মরণ করিয়া সে ভাবতে লাগলো কি করে সে একটি নোংরা জায়গায় এলো। সে নিজের দেহের দিকে তাকিয়ে বুঝতে পারলো সংজ্ঞাহীন অবস্থায় জানোয়ারগুলি তাঁর দেহের উপর অমানুষিক অত্যাচার করিয়াছে এবং সে দেখিল একটি সায়া এবং ব্লাউজ পরিধানে রহিয়াছে। পাশে শাড়িটি টুকরো টুকরো হইয়া ছিঁড়িয়া পড়িয়াছে। শর্বরী উঠিবার চেষ্টা করিল কিন্তু না! পারিল না। হঠাৎ একটি লোক কিছু খাবার হাতে লইয়া প্রবেশ করিল। লোকটি প্রবেশ করিয়া খাবার রাখিয়া শর্বরীর নিকট আসিল তারপর তাকে কাছে টানিতে যাইল।

শর্বরী সমস্ত কিছু বুঝে লোকটির সহিত অভিনয় করিতে লাগিল লোকটি শর্বরীর কাঁধে হাত রাখিয়া বলল কি সুন্দরী, আমাকে তুমি চাওনা ?

শর্বরী স্মিত হাস্যে বলিল, অবশ্যই, তোমাকে আমি কতো ভালবাসি। তোমার জন্য আমি জীবন বিসর্জ্জন দিতে পারি। লোকটি শর্বরীর কথায় গলিয়া গেল। শর্বরীকে আস্তে আস্তে কাছে টানিয়া কপালে ও মুখে চুম্বন করিল। শর্বরী তাকে ছাড়াইয়া বলিল, জল খাওয়াতে পারো ? লোকটি একটি মদের বোতল দেখাইয়া বলিল, এটা খাবে ? শর্ব্বরী অভিনয়ের ছলে বলিল, এটা কি জিনিষ ? লোকটি উত্তর দিল মদ চলবে না কি ?

শর্ব্বরী বলল নিশ্চয় ও ; দারুন আনন্দ হচ্ছে কতোদিন বাদে মদ খাবো।

লোকটি একটি গ্লাসে মদ ঢালিতে লাগিল। শর্ব্বরী বলিল না! আমি বোতল ধরে খেতে পারবো—আমাকে বোতলশুদ্ধ দাও।

লোকটি তখন শর্ব্বরীর হাতে বোতলসমেত মদ দিল। লোকটি শর্ব্বরীকে আলিঙ্গণ করলো তারপর ব্লা টেনে খুলে যেই সায়ার দড়ি ধরে টান দিল তৎক্ষণাৎ শর্ব্বরী বোতলটি অর্ধেক ভাঙ্গিয়া ভাঙ্গা বোতলটি লইয়া লোকটির মাথায় প্রচণ্ড জোড়ে আঘাত করিল লোকটি বেকায়দায় পড়িয়া গেল—মাথা হইতে দরদর্ করিয়া রক্ত বাহির হতে লাগলো—মাটিতে ছট্‌ফট্ করিতে লাগিল।

তৎক্ষণাৎ শর্বরী ব্লা ও ছায়া ঠিক করিয়া ছিন্ন শাড়ীটি পড়িয়া দরজার বাইরে আসিল তারপর রাস্তায় আসিয়া দেখিল কয়েকজন গুণ্ডাশ্রেণীর লোক তাঁর সুঠাম দেহ দেখিয়া ছুটিয়া আসিতে লাগিল। শর্বরী সোজা সমুদ্রের দিকে ছুটিতে লাগিল। প্রাণপণ ছুটতে ছুটতে অবশেষে সমুদ্রের জলে নেমে গভীর জলে যেতে লাগলো।

লোকগুলি সমুদ্র নিকটে আসিয়া চেঁচামিচি আরোম্ভ করিয়া দিল। কিন্তু তৎক্ষণাৎ একটি প্রকাণ্ড ঢেউ আসিয়া সর্বরীকে সমুদ্রের অনেক দূরে টানিয়া লইয়া গেল এবং অপর একটি ঢেউ তাকে টানিয়া মৃত অবস্থায় সমুদ্রতীরে আছড়াইয়া ফেলিল। লোকগুলি ধরাধরি করিয়া তীরে টানিয়া আনিল বুঝিতে পারিল পাখী, খাঁচা ছাড়িয়া পালাইয়াছে অর্থাৎ সে মৃত—দেহে প্রাণ নেই।

একটি সংসার মধ্যখান হইতে অভিশপ্তর অতলতলে হারাইয়া গেল সেখান হইতে কাহাকেও আর ফিরাইয়া আনা সম্ভবপর নহে। ভাগ্যদেবতার এই নিষ্ঠুর খেলা—প্রকৃতি যেন শোধ লইতেই দৃঢ় সংকল্প। এরপর জানকিদেবী পুত্রশোকে মর্মাহত হয়ে আত্মহত্যা করলেন—গল্পের এখানেই শেষ নয়। এই গল্পের প্রতিধ্বনি হয়েছিল বছর কয়েক পূর্বে আমাদের এই পশ্চিমবঙ্গে তারই প্রতিধ্বনি শুনুন:

ছোট্ট একটি মফঃস্বল শহর। নাম তার রায়পুর, সেকালে জমিদারদের প্রধান ঘাঁটি ছিল এই রায়পুরে। বহু দেশ হইতে বহু লোকজন এখানে আসিয়া বসবাস করিতেছে। রায়পুরে বেশিরভাগ জায়গা বেষ্টিত করে রয়েছে অসংখ্যক খনি। মাটির নীচে লোহা, তামা, পেট্রল, কয়লা ইত্যাদি নানা আকরিক পাওয়া যায়। পার্শ্ববর্তী এলাকা বিলাসপুরেও বড় বড় খনি বর্তমান। সেখান হইতে ভারতবর্ষের বহু জায়গায় কয়লা ও নানাধরণ আকরিক, পেট্রল ইত্যাদি নানান দেশে চালান যাচ্ছে।

এই রায়পুরেই থাকেন মস্তবড নামকরা ধনী রঞ্জিত চৌধুরী। রায়পুরে অবশ্য সকলের নিকট তিনি 'চৌধুরী সাহেব' নামেই পরিচিত। কলকাতায় তাঁর মস্তবড বাড়ী এবং কাপড়ের দোকান রহিয়াছে। এছাড়া একটি চোরাই কুঠি--দোকানের পিছনে বর্তমান। সেখানে কান্টি স্পিরিট, দেশী-বিলিতি মদ, হুইস্কি, আফিং, গাঁজা ইত্যাদি বিদেশ থেকে চোরাই পথে চালান হয় এবং ওই কুঠির মধ্যেই সমস্ত স্মাগলিং জিনিষ মজুত থাকে,—এই সেই চোরাই কুঠি যেখান হইতে কলকাতার বড বড হোটেল রেষ্টুরেন্টে এই সমস্ত দ্রব্যসামগ্রী পাচার করা হয় এবং তাহা বিক্রয় করা হয়।

রায়পুরে চৌধুরী সাহেব স্থানীয় অফিসের জেনারেল ম্যানেজার তিনি ব্যাচেলার মানুষ—বিবাহিত নন।

তাঁর বাড়ীর দিক হইতেই যে বস্তিটি আরম্ভ হয়েছে তিনি এই বস্তিরই মালিক। চৌধুরী সাহেব ছিলেন মদ্যপায়ী এবং কুচরিত্র,—তাঁর চরিত্র নিয়ে অনেকে অনেক রকম সন্দেহ করে।

এই বস্তিতেই থাকে চৌধুরী সাহেবের অফিসের সামান্য কেরাণী মিঠুন চক্রবর্তী। মিঠুন বস্তিতে থাকলেও সে সকলের চাইতে আলাদা। সে খেটেখুটে নিজের ঘরটিকে অন্য সবার চাইতে আলাদা—অর্থাৎ সুন্দর করে সাজিয়েছে। মধ্যবিত্ত পরিবার। মা, বোন এবং বৃদ্ধ পিতাকে নিয়েই তাঁর সংসার। মিঠুনের বাবা সম্প্রতি রিটায়ার্ড (Retired) করিয়াছেন। তিনি ছিলেন খুব জেদী লোক —অন্যায়কে তিনি দুইচক্ষে দেখিতে পারিতেন না। কোনদিন অন্যায়কে প্রশয় দেননি তিনি ছিলেন সৎধর্ম অবলম্বী এবং কর্তব্যে নিষ্ঠ এবং অমায়িক লোক খুব কম ছিলেন—যে অফিসে তিনি কাজ করিতেন।

মিঠুনের বাবা কর্তব্য'র জন্য বড় সাহেবের নিকট হইতে প্রশংসা অর্জন করিয়াছিলেন। অফিসের একটি লোক বেশ চটিয়াছিল কারণ মিঠুনের বাবা হাতেনাতে চুরি করিবার সময় ধরিয়া দিয়াছিল। এবিষয়ে অফিসের বেশকিছু ব্যক্তি মিঠুনের বাবার উপর চটিয়া গিয়াছিল। তাঁরা সকলে ক্ষতি করার জন্য উঠে পড়ে লেগেছিল। —একজনের ভাল আরেকজন দেখতে পারতো না—ঈর্ষায় জ্বলিত।

দ্বিতীয়বার মিঠুনের বাবা পুণরায় অফিসের কর্মচারী অর্থাৎ সেই লোকটিকে চুরির জন্য (অফিসের বেশ কিছু দ্রব্য আত্মসাৎ করায়) হাতেনাতে ধরিয়া বড় সাহেবের নিকট লইয়া গেলেন— বড় সাহেব তৎক্ষণাৎ চাকরী হইতে লোকটাকে বরখাস্ত করিয়া ছিলেন। লোকটি পথে বসিল নিজের কর্মদোষে, কিন্তু লোকটির সমস্ত রাগ গিয়া পড়িল মিঠুনের বাবার উপর। লোকটি প্রতিশোধ লওয়ার জন্য উঠে পড়ে লাগলো।

একদিন সুযোগ বুঝে দুটি গুণ্ডার সাহায্যে মিঠুনের বাবা যখন ব্যাঙ্ক হইতে হাজার পাঁচেক টাকা তুলিয়া রাস্তা দিয়া আসিতেছিল তখন ছিনতাই করিল সমস্ত অর্থ। মিঠুনের বাবা অবশ্য বুঝতে পারলেন না যে এর মধ্যে সেই লোকটি যুক্ত আছে। তিনি অত্যন্ত দুঃখ পেলেন। তিনি ইচ্ছা করেছিলেন পাঁচহাজার টাকা দিয়ে বাড়ীটি মেরামত করে তুলবেন! ইচ্ছা অসম্পূর্ণ রয়ে গেল কিছুই করা হলো না।

তাঁর ছেলে মিঠুন ও মেয়ে হেমা দুজনেই কলেজে পড়ছিল। পড়াশুনায় দুজনের কেহই ভালো ছিলনা কিন্তু দুজনেই গানবাজনা খেলাধুলায় খুব ভাল ছিল। গান বাজনা এবং খেলাধুলায় কৃতিত্ব পেয়েছিল, বহু প্রশংসা এবং প্রাইজ ঘরে এনেছিল।

ছোটবেলায় দু ভাইবোন বহু ফাংশানে গান-বাজনা করেছিল। মিঠুন ভাল গেয়ে চলেছিল বোন হেমা সুন্দর নৃত্য করে সকলকে তাক্ লাগিয়ে দিয়েছিল প্রচুর পরিমাণে দর্শকদের হাততালি এবং অসংখ্যক প্রসংসা সেই দিন পেয়েছিল।

সেবার একটি ফাংশানে মিঠুন গান গাইছিল (মান্না দে'র গাওয়া 'গোরী তেরী পা ঝণিয়া) আর বোন হেমা এত সুন্দর নৃত্য পরিবেশন করেছিল যে সকল দর্শক এবং শ্রোতারা জয় প্রশংসায় পঞ্চমুখ।

দু ভাইবোন (কলেজে পড়ার সময়) সত্যিই খুব মিশুকে ছিল এবং স্মাটনেস বজায় রেখে চলত যে কোন কাজ বললে দু ভাইবোন প্রথমে অগ্রসর হতো।

মিঠুনের বোন হেমা ছিল সত্যিই সুন্দরী কলেজের পড়ার সময় বহু পুরুষ মানুষের দৃষ্টি তাঁর দিকেই নিবদ্ধ ছিল— সুন্দরী এবং গান বাজনা খেলাধুলায় এক্সপার্ট এবং ফরোয়ার্ড থাকায় বোধহয় সকলে তাঁকে খুব ভালোবাসতো হেমা বেশ মিশুকে ছিল সকলের সঙ্গে সুব্যবহার এবং মিষ্টি ভাবে

কথা বার্ত্তা বলতো। এই সমস্ত কারণে সকলে খুব ভালবাসতো এবং হেমাকে পছন্দ করতো। জেনারেল ম্যানেজার চৌধুরী সাহেবের দৃষ্টিও ছিল মিঠুনের বোনের প্রতি। তিনি অনেকবার হেমার সঙ্গে ঘনিষ্ট হওয়ার চেষ্টা করেছেন কিন্তু হেমা তাঁকে পাত্তাই দিতনা বারবার Avoid করে চলতো। কথা বার্ত্তা বলতে এলেই অপমান করতো কারণ ছিল-সাহেব বারবার ভালবাসার কথা বলে হেমাকে বিরক্ত করে তুলেছিল।

এছাড়া হেমা জানত সাহেবের চরিত্র সম্বন্ধে নানান কথা সেইজন্য ঠিক পছন্দ করতো না চৌধুরী সাহেবকে, বরাবর সাহেবকে ফিরিয়ে দিতো অপমান করে ও এড়িয়েই চলতো সব সময়।

চৌধুরী সাহেব এড়িয়ে চলাটা লক্ষ্য করে জেদ চেপে গিয়েছিল তিনি মনে করেছিলেন, "যেমন করেই হোক্ তাঁর হেমাকে চাই।" চৌধুরী সাহেব মাঝে মধ্যে কলেজে আসতেন নিজের গাড়ী ড্রাইভ করে কারণ হেমার সঙ্গে আলাপ পরিচয় করার জন্য।

একদিন, কলেজের f Period-এ হেমা কয়েকজন বান্ধবীদের সঙ্গে মাঠে বসে গল্প করছিল। নানান আলাপ আলোচনা চলছে বান্ধবীদের সঙ্গে। খেলাধুলা, পরাশুনার কথা গানবাজনা এক্ মিষ্টি প্রেমের কাহিনী এক্ চুট্‌কী ইত্যাদি চলছিল। এমন সময় চৌধুরী সাহেব ট্যাক্সী করে কলেজের মাঠে এলেন। ট্যাক্সী থেকে নেমে হেমার' দিকে আস্তে আস্তে এগিয়ে চললেন।

সকল বান্ধবীদের সামনে এসে সাহেব হেমাকে ডাকলেন। হেমা প্রথমে অস্বীকার করলো বান্ধবীরা সকলে বলল দেখ্, কি আবার বলে? বান্ধবীদের কথায় হেমা বুকে সাহস সঞ্চয় করে সাহেবের সঙ্গে চলল। বেশ কিছুটা গিয়ে ট্যাক্সী দেখিয়ে সাহেব বলল চলো, কোথাও ঘুরে আসি— এখনতো এমনি বসে ছিলে কোন ক্ষতি হবেনা! এই কথা বলে সাহেব হেমার কাঁধে হাত রাখতেই হেমা খানিকটা সরে গেল। সাহেব হেমাকে কাছে টানতে চাইলেন হেমা তখন ননসেন্স বলে চলে গেলো যেখানে বান্ধবী'রা সকলে বসেছিল। বান্ধবীরা বলে উঠল কি বলল রে? হেমা বেশ কিছুক্ষন চুপ করে বলল, কি আর বলবে যা বলে! বান্ধবী'রা সকলে হো-হো করে হেসে উঠল। একজন বান্ধবী হাসী থামিয়ে বলল বল্না প্লিজ্, শুনতে চাই দারুন ইন্টারেষ্টিং। হেমা বলল (সাহেবের গলার মতো করে) শোন্ তবে। —আমি তোমাকে বিয়ে করতে চাই, এখন ট্যাক্সী করে বেড়াতে চলো তারপর তোমাকে নিয়ে ফূর্তি করবো ইত্যাদি ইত্যাদি— — বান্ধবীরা সকলে বলে উঠল ইস্, বললেই হলো! দেবো দু'চার ঘা ঠিক হয়ে যাবে —

যাইহোক্ বান্ধবীরা সকলে পুনরায় ক্লাসে চলে গেল সময় উত্তীর্ণ হয়ে যাওয়ায়। একদিন রাস্তায় যখন হেমা হেঁটে যাচ্ছিল তখন সাহেব নিজস্ব গাড়ী চালিয়ে আসছিল হঠাৎ সাহেব ব্রেক কষে দাঁড় করাল গাড়ীটিকে। তারপর নেমে হেমার পাশে এলো। হেমা থমকে দাঁড়িয়ে গেলো। হেমাকে বলল, "আই লাভ্ ইউ-ইউ লাভ মী।" হেমা রেগে গিয়ে পথ ধরে হাঁটতে শুরু করলো। সাহেব পিছু নিলো বেশ কিছুটা গিয়ে সাহেব পেছন থেকে ল্যাং মেরে হেমাকে ফেলে দিলো হেমা রাস্তায় পড়ে গেল। সাহেব নিজস্ব গাড়ীতে উঠে ষ্টার্ট দিল এবং চলে গেল। সেইসময় চিন্ময় সাইকেলে করে রাস্তা দিয়ে যাচ্ছিল। সাইকেল থামিয়ে ব্যাপারটা দেখছিল। চেঁচিয়েই বলল হায় রে হায় শেষকালে ল্যাং মারলো। কেনো যে লাইন করতে যাওয়া হয় কে জানে! রাম-রাম ওয়াক্ থু-থু এই কথা বলেই হেমাকে হাত ধরে তুলে দিল তারপর সাইকেলে চড়ে চিন্ময় চলে গেলো।

হেমার প্রচণ্ড পা ব্যথা করছিল কোনো রকমে খোঁড়াতে খোঁড়াতে বাড়ির উদ্দেশ্যে চলতে লাগল। কিছুক্ষন হাঁটার পর বাড়ি এসে পৌঁছল। বাড়ী কোনো কিছুই এ সম্বন্ধে জানাল না জানিয়ে লাভ নেই সুতরাং কি হবে।

বস্তিবাসীরা সকলে মিথে "হেমা মিঠুনকে" ভক্তি শ্রদ্ধা এবং স্নেহ করতো কোনো বিপদে আপদে সকলে ছুটে আসতো। সকলে খুব সাহায্য করতো। বস্তিবাসীরা সকলে হেমা মিঠুনকে সত্যেই বেশ ভালোবাসতো। তাঁরা সকলে বেশ আনন্দে দিন অতিবাহিত করতে লাগলো। একদিন চিন্ময় বেশ মজা করার জন্য একটি কাহিনী প্রস্তুত করলো বস্তিবাসীদের সকলকে ডেকে বলল আমি একটি গান বানিয়ে সকলের সামনে নাচবো সকলকেই (মিঠুন ও হেমা সমেত) নাচতে হবে। এরপর সাইকেলে চেপে চিন্ময় বেশ বেগেবিভাবে চালিয়ে রবির ঘাড়ের উপর পড়লো তারপর রবি উল্টে মাটিতে পড়ে গেল, চিন্ময় সাইকেল ছেড়ে রবিকে হাত ধরে মাটি থেকে তুলে গা লোক ধুলো ঝেড়ে দিল। রবি সুযোগ বুঝে সাইকেলে চেপে পালাতে গেল কিন্তু চিন্ময় তারপূর্বে রবিকে পিছন থেকে ল্যাং মেরে মজার গান গেয়ে নাচতে লাগলো এবং তারসঙ্গে সকলকে নাচতে বললো

ল্যাং মেরে ঠ্যাং ভেঙে ফেলেদাও

তবু নতুন করে ল্যাং মেরো না।

জীবন যখন যায় যায় অবস্থা

(তখন) ল্যাং মারলে তুমি

এবার বুঝি পড়বো মরে

তোলোই থেকে ভূমি ॥

এই ল্যাং মারার জীবনটারে

পিছিয়ে দাও কিছু

কেন যে ল্যাং মারো কিছু কি জানোনা !

(তবু নতুন করে আর ল্যাং মেরোনা)

জীবনে কিছুই যে পাবোনা

এদেশ ছাড়া অন্য কোথাও যাবোনা

ধরুক না কোন না কোন-ও এক রোগে

যেতেই হবে 'বুঝলে' মায়ের ভোগে ।"

একদিন না একদিন বুঝবে যেদিন,

তখনি দুঃখে তোমার কান্না আসবে সেদিন;

আসছেই আসছে সেই দিনক্ষন

(আর বেশি দেরী নেই সত্যিই আসছে)

তোমায় 'যেতেই হবে বুঝলে ! ভাবো সারাক্ষন ।

তখনি বুঝবে তুমি— কি করলাম। নিজেই জানিনা, মনটাকে জানিনা বাস্তিবাসীদের মধ্যে অনুপ হালদার, রবি ঘোষ, মিঠুন এবং হেমা একটি ফাংশান করল ।

ফাংশানের দিন উপস্থিত টিকিট ভালোই বিক্রী হলো হল পরিপূর্ণ দর্শক । আস্তে আস্তে মঞ্চে একের পর এক প্রোগ্রাম আরম্ভ হলো । প্রথমের রবীন্দ্র সঙ্গীত দিয়ে অনুষ্টান শুরু হলো । তারপর কমিক, আধুনিক গান, নৃত্য পরিবেশন হলো । এরপর ছোট্ট অথচ মডান টাইপের একটি নাটক আরাম্ভ হলো ।

অসংখ্য দর্শককের হাত তালিতে প্রেক্ষাগৃহ জমজমাট হয়ে উঠলো— পরিশেষে অনুষ্টানের সমাপ্তি ঘোষনা করা হলো । মোটা টাকা লাভ হয়েছিল সেই অনুষ্ঠান করে । তারপর নেতাজী ইন্‌ডোর ষ্টেডিয়ামে গান বাজনা এবং ইডেন গার্ডেন মাঠে ক্রিকেট খেলার বেশ কিছু তথ্যচিত্র তুলে

বস্তিবাসীদের সকলকে দেখানো হয়েছিল বিনামূল্যে — সকলে বেশ খুশী মনে সমস্ত কিছু উপভোগ করেছিল। একদিন রবি ও অনুপ ঘুরতে ঘুরতে দেখলো একটি মেয়ে জল ছিটিয়ে স্নান করছে। অনুপ ও রবি একটি পাথরের আড়ালে বসে দেখছিল। রবি হটাৎ অনুপ কে বললো, মাইরি আমার একটা আইডিয়া এসেছে। তুই চুপচাপ বসে শুধু দেখেযা।

অনুপ চুপচাপ দেখতে লাগলো রবি কি করে। রবি আস্তে আস্তে। রবি নদীর ধারে গিয়ে মেয়েটির শাড়ী নিয়ে একটি বড় পাথরের আড়ালে চলে গেল।

অনুপ ভাবতে লাগলো কি করে দেখা যায় হটাৎ দেখা গেল শাড়ীপরে একটি মেয়ে নদীর ধারে এলো — নদীর জলে তখনও মেয়েটি স্নান করে চলেছে — অনুপ বা রবিকে মেয়েটি দেখতে পাইনি

মেয়েটি (রবি বেশী) অনুপকে দেখতেই চোখ মারলো — অনুপ ঠিক বুঝতে পারছেনা কি হবে। চুপচাপ বসে দেখে যাচ্ছে এরপর কি হয়। একসময় যে মেয়েটি নদীর জলে স্নান করছিল স্নান সেরে জল থেকে উঠে দেখে তার শাড়ী নেই মেয়েটি লজ্জায় জলে নেমে গেলো। এমন সময় একটি পুলিশ নদীর পাশ দিয়ে যাচ্ছিল মেয়েটিকে ওই অবস্থায় দেখে আস্তে আস্তে জলে নেমে মেয়েটিকে জাপটে ধরতে গেলো মেয়েটী জলথেকে উঠে দৌরে পাথরের আড়ালে লুকিয়েপড়ে নিজেকে আত্মগোপণ করলো। পুলিশটি জল থেকে উঠে হাঁপাতে লাগলো।

সেইসময় (রবি বেশী) শাড়ীপরে রবি মেয়েটির নিকট গেলো মেয়েটি বুঝতে পারলোনা যে সে পুরুষ মেয়েটি বললো হেল্প মী প্লিজ গিভ মী এ শাড়ী। রবি তাঁর শাড়ী খুলে মেয়েটিকে দিল মেয়েটি পড়ে রবিকে চুমু খেলো এদিকে অনুপ আস্তে আস্তে নিকটে এসে দেখে দুজন রবিও মেয়েটি বেশ লড়াই করছে।

হঠাৎ অনুপকে দেখে মেয়েটি ছেড়ে দাঁড়িয়ে বললো চলি বলেই সেইস্থানথেকে এক দৌড়ে রাস্তার দিকে চলেগেল। পুলিশটি মেয়েটিকে ধরার জন্য পিছু পিছু দৌড়ালো।

রবি দেখলো বেগতিক। সে ও অনুপ পুলিশটির পেছনে দৌড়ালো যখন পুলিশটি মেয়েটিকে ধরে হিড়হিড় করে একটী জঙ্গলের দিকে টেনে নিয়ে গেল তখন অনুপ ও রবি রাসতায় থেমে দাঁড়াল। দুজনে নিজেদের মধ্যে ইশারা করে হাসলো তারপর রাসতার উপর বসে পড়লো কিছুক্ষন পর জঙ্গলথেকে মেয়েটি পুলিশসমেত হাসতে হাসতে বাইরে এলো। পুলিশটি মেয়েটির কোমর জড়িয়ে ধরে বার বার মেয়েটি কে চুমু খাচ্ছিল।

অনুপ ও রবি সোরাল অন্যদিকে তাকিয়ে বলল, ছি দেখতে নেই। তারপর আসতে আসতে পুলিশ ও মেয়েটি চলে গেল। অনুপ রবিকে বললো দুর সালা কিছুই হলো না চল বাড়ী যাই — এই সময় দোকানে বসে বিড়ি বাঁধলে দুটো পয়সা হতো। বেকার সময় নষ্ট হলো যতোসব ছামেলা। মিঠুন চাকরীর জন্য বহু জায়গায় দরখাসত করেছিল কিন্তু ইনটারভিউ পেয়েও চাকরী হয়নি। মিঠুন বুঝতে পেরেছিল এখনকার যুগে সেরেফ বাকিং ছাড়া কিছু হওয়া সম্ভব নহে।

একবার মিঠুন ও বস্তিবাসীদের একজন নাম অনুপ হালদার — দু জনে মিলে চাকরীর ইনটারভিউ পেয়ে কলকাতায় গেল।

কলকাতায় দু জনে এসে অফিসের ভিতর প্রবেশ করলো — অফিসের বড় সাহেব গদিযুক্ত চেয়ারে মুখে পাইপ ধরিয়ে বসে রয়েছে দেখল দরজা দিয়ে এক একজনকরে ক্যাণ্ডিডেট প্রবেশ করছে মিনিট পাঁচ-ছয় পড়ে মুখ গোমড়া এক মাথা নীচু করে বাহির হয়ে আসছে

কি ব্যপার তাদের ঠিক বোধগম্য হলনা। একসময় তাদের ডাক পরলো একে একে। প্রথমে অনুপ হালদার প্রবেশ করলো সাহেবের ঘরে। সাহেব বলতে বললো। অনুপ বসতেই, অনুপের নিকট হইতে কাগজ পত্র চেয়ে নিয়ে সাহেব বললো আমি তোমাকে বেশকিছু প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করবো ঠিক্ ঠিক্ উত্তর দেবে। অনুপ বললো চেষ্টা করবো স্যার। সাহেব বলল ও কে সাহেব আরাম্ভ করলো আর অনুপ হালদার উত্তর দেবার জন্য চেষ্টা করতে লাগলো। সাহেব প্রশ্ন করলো বলো তো ছোক্‌রা, তোমাকে আউটরাম ঘাটে নিয়ে এসে একটি ঢিল হাতে যদি বলা হয় ঢিলটি গঙ্গার ওপারে ছুড়তে পারবে? -ঢিলটি গঙ্গার ওপার করতে পারবে কি। অনুপ বলল এ আর শক্ত কি স্যার। সেরেফ হাতে৷ কাজ হাফিস করে দেবো তারপর আপনাকে বলবো ওপারে ঠিক চলে গেছে বুঝলেন? এছাড়া দ্বিতীয় পন্থা আমার জানা নেই। তবে আমার মনে হয় আপনি নিশ্চয় সমুদ্রের এপার থেকে ঢিল ছুঁড়ে লঙ্কায়' রাবন রাজার দেশে' ঢিল ছুঁড়তে পারবেন। সাহেব রেগে গিয়ে বলল, এর অর্থ কি? আমার সাথে ইয়ার্কি কোরোনা হে ছোক্‌রা। আমি তোমার ইয়ার নই, আমার সাথে চ্যাংড়ামো করে কোন লাভ হবেনা, বুঝেছো।

অনুপ বললো দেখুন স্যার একটা সম্ভব অসম্ভব বলে কথা আছে— আপনি কি করে বলেন গঙ্গার এপার থেকে ওপারে ঢিল ছুড়ে পার করবো? সাহেব বলল, তুমি আসতে পারো? আমরা এরকম লোককে চাকরী দিইনা। অনুপ রেগে গিয়ে বলল তা তো বটেই। ভাঁওতা বাজি আর ঘুষ খেয়ে কতোদিন চালাবেন স্যার। এবার ভালয় ভালয় যে কোনো একটা চাকরীর ব্যবস্থা করে দিন, তা না হলে বুঝতেই পারছেন কি করে বাড়ি ফিরবো-মা-বাবার যেখানে মাথ্ (M, B B, S) ডিগ্রী কাধে নিয়েও কিছুই লাভ হলোনা।

'সাহেব বেশ কিছুক্ষন থেমে আস্তে আস্তে বলল একটি উপায় আছে। অনুপ বলল কি ? সাহেব থেমে বলল, যদি কিছু মাল কড়ি মানে হাজার পাঁচেক টাকা দিতে পারো তা'হলে চাকরীর সংস্থা হবে তা না হলে কিছুই হবেনা। অনুপ তখন বললো, তাহলে আমাকে ফালতু প্রশ্ন করে হ্যারা'স করছিলেন কেনো ? বললেই পারতেন যে মালছাড়া আপনি কাউকে চাকরী দেবেন না শুধু শুধু সময় নষ্ট করে আসা। অনুপ আরও বললো, আমার কাছে হাজার টাকা নেই ধরুন আমি অমি অনেক কষ্টে হাজার পাঁচেক টাকা যোগাড় করে আপনাকে দিলাম এবং আপনিও আমাকে চাকরীতে নিযুক্ত করলেন। কিন্তু আমার মনে হচ্ছে আপনার নিকট চাকরী করার থেকে বিজনেস্ করা ঢের 'ঢের ভালো— আপনার হাতে একটি পয়সাও দেবো না'— এই কথা বলে সাহবের চেম্বার থেকে অনুপ বাহিরে এলো দেখলো মিঠুন বসেছিল। এবার মিঠুনের ডাক পড়লো। মিঠুন সাহেবের চেম্বারে প্রবেশ করলো।

সাহেব বেশ কিছু উল্টোপাল্টা কশ্চেন জিজ্ঞাসা করল — মিঠুন সাহসের সঙ্গে প্রশ্নের উত্তর দিলো কিন্তু না: হলোনা। পুনবার টাকার কথা বলাতে মিঠুন নো থ্যাঙ্কস্ বলে বাইরে এলো এবং দু'জন বন্ধু ট্রামে করে ধর্মতলা এলো। ওখানথেকে হাঁটতে হাঁটতে এক সময় তারা দু জন ভিক্টোরিয়া 'পৌছাল চারিদিক ঘুরে দেখতে লাগলো তারা একটি গাছের তলায় বসলো। তারা দু জন আশেপাশে তাকিয়ে দেখতে লাগল বিস্ময়ে। জোড়ায় জোড়ায় গাছের তলায় বসে আছে অর্ধেক শুয়ে আছে প্রেমিক প্রেমিকার দল। হটাৎ দুটি মেয়ে মিঠুন অনুপের নিকট এসে বললো চলবে কি ? অনুপ হটাৎ বললো কতো ' দুটি মেয়ে হেসে জবাব দিল দু টাকা। মিঠুন রেগে অনুপকে টানতে টানতে ট্রামের উদ্দেশ্যে রাস্তায় এলো। মেয়েদুটি হো-হো করে হেসে বলল. "বাঃ বাঃ ভ্রমরদের রাগ দেখো ? মধু খাবে কিন্তু মূল্য দেবেনা"— হাঃ হাঃ করে হাসতে লাগলো।

যাইহোক দুজন বন্ধু পুনরায় রায়পুর ফিরে এলো। অতুল চাকরীর আশা ছেড়ে দিয়ে একটি পান বিরির দোকান খুলে বসলো।

মিঠুন কলেজে পড়ার সময় খুব ডানপিটে দুরন্ত ছিল। একবার কলেজে বেশকিছু বন্ধুর সঙ্গে কথাকাটাকাটি হলো হাতদেখার ব্যাপার নিয়ে। জোর তর্ক চলছে একদল বলছে হাত দেখা নয় লোক ঠকিয়ে চিট করে জ্যোতিষ বিদ্যা চালাচ্ছে। আরেকদল ব্যাপারটা অতি সহজে মেনে নিতে রাজী নয়। ঠিক হলো যে দল জিতবে তাদের পেটভরে মিষ্টি খাওয়ানো হবে। তারপর একদিন কলেজ হইতে দলবলসমেত মিঠুন চললো উদ্দেশ্য হাত দেখানো। গন্তব্য স্থলে পৌছালে তারা দেখতে পেলো সাইনবোড লেখা রয়েছে" শ্রীশ্রী ক্যা-মাক্ষাচরণ তলাপাত্র। জ্যোতিষশাস্ত্র লইয়া এখানে আলোচনা করা এবং হাত উত্তম রূপে দেখা হয়। সময়: সকাল ৮টা হইতে ৭টা পর্যন্ত। বৃহস্পতিবার সম্পুর্ণ পূর্ণ দিবস অর্থাৎ বন্ধ।

যাইহোক সকলে জ্যোতিষীর ঘরে প্রবেশ করিল। জ্যোতিষ সকলকে বসতে বললো। তারপর কিছুক্ষণ বাদে মিঠুনকে বললো তোমরা এসব বিশ্বাস করোনা, তাই না? --- দেখি তোমার হাত-খানা বলে মিঠুনের হাত দেখতে লাগলো। হাত দেখা শেষ করে ধীরে ধীরে বললো দেখছি সবতো ভালোই। তখন পাশ থেকে একটি বন্ধু ব্যঙ্গ করে বললো, খারাপটা বললেন নাতো, —খারাপটা শুনতে চাই, বলুন?

তখন জ্যোতিষী একটু থেমে বলল তোমার বাবা কিছুদিনের মধ্যেই মারা যাবেন, সংসারের সমস্ত দায়-দারিত্ব তোমার উপর এসে পড়বে। তোমাদের সংসারের উপর একটি বড় রকমের অভিশাপ আছে ---পুড়ে ছারখার হয়ে যাবে সমস্ত কিছু। আমি যে একটুও বাড়িয়ে বলছিনা তার প্রমান বেশ কিছুদিনের মধ্যেই পাবে ---ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করো সব বুঝতে পারবে।

মিঠুন বেশ দমে গেলো ---তার মনটা এক অজানা আশঙ্কায় দুলতে লাগলো। বন্ধুরা সকলে সান্তনা দিতে লাগলো। সকলে মিলে পুনরায় জ্যোতিষীর নিকট হইতে কলেজের উদ্দেশ্যে চললো। মিঠুনের মনটা কেঁপে কেঁপে উঠতে লাগল অজানা আশঙ্কায়।

বন্ধুরা বুঝতে পেরে বলল তুইও যেমন আজ কালকার ওসব জ্যোতিষীর কথা কেহ বিশ্বাস করে। তোকে বোকা পেয়ে খুব চাল চেলে গিয়েছে? বন্ধুরা সকলে একস্বরে বলল কিছু ভাবিস না। 'অল বোগাস্।'

বেশকিছুদিনের মধ্যে ---যখন, হোলির উৎসবে চারিদিক মুখর হয়ে উঠেছে মিঠুন-হেমা বস্তিবাসীরা সকলে হোলির উৎসবে ফাগ উড়িয়ে রাস্তায় বাহিব হয়ে গান-বাজনা নেচে চলেছে হঠাৎ সেই সময় মিঠুনের বাবা আনন্দে আত্মহারা হয়ে দৌড়ে রাস্তায় আসতে গিয়ে হুমড়ি খেয়ে রাস্তায় পডলেন এবং জ্ঞান হারালেন।

গানবাজনা থামিয়ে সকলে ছুটে এলো ধবাধরি করে মিঠুনের বাবাকে ঘরের মধ্যে নিয়ে বিছানা শুয়ে দেওয়া হলো। বেশ কিছু ক্ষন বাদে জ্ঞান ফিরলে জয়া দেবীকে আস্তে আস্তে বললেন কাছে এসো, জয়া দেবী কাছে এলেন: ---মিঠুনের বাবা টেনে টেনে কথা বলতে আরাম্ভ করলেন, বললেন তুমি ও দের দেখো আ মি-চল-লা-ম এ স'সারে-র উ-প-র অভিশা-প আছে সব ছার খা-র হয়ে আঃ আঃ মিঠুনের বাবা বিছানায় এলিয়ে পডলেন চিরনিদ্রায় চলে গেলেন।

জ্যোতিষীর কথা যে মিথ্যে নয় মিঠুন সে মুহূর্তে বুঝতে পারলো। কিন্তু যা হবার তা হয়ে গেছে তাঁকে তো আর ফেরানো যাবে না। হেমা এবং জয়া দেবী কান্নায় ভেঙ্গে পড়লেন। একসময় খাটে করে ফুলেরমালা ধুপচন্দন দিয়ে সাজিয়ে বস্তিবাসীরা সকলে চলিল 'শ্মশান ঘাটে' দাহ করিবার জন্য। মিঠুন চলিল সকলের পিছনে পিছনে। এদিকে মিঠুনের বাবার অফিসের সেই লোকটি (যাকে বড সাহেব সাসপেণ্ড করেছিল) চলিল মাথানীচু করে।

সকলের সঙ্গে সঙ্গে। সকলে একসময় শ্মশানে এসে পৌঁছল— শব ঘাট থেকে নামানো হলো। —শ্মশান ঘাটে সমস্ত কাজ চল ছিল। এক সময় সেই লোকটি মিঠুনের বাবার পায়ে অজস্র ফুলের মালা দিয়ে নত হয়ে প্রনাম করলো তাঁর চোখ দিয়ে জল ঝরে পড়ছে মিঠুনের চোখেও জল একসময় শবে অগ্নি দেওয়া হলো – সকলে দাঁড়িয়ে সে দৃশ্য দেখতে লাগলো। দূরে হাওয়ায় কোথা থেকে একটানা গানের সুর ভেসে আসছিল "জীবণে যারে তুমি দাউনি মালা,

মরনে কেন-ও তারে দিতে গেলে ফুল"

গানটি একটানা করুন সুরে বাজছিল।

এদিকে মিঠুন চৌধুরী সাহেবের অফিসে কেরানীর চাকরী পেলো। যাইহোক্ কাজ শেষ হওয়ার পর সকলেমিলে বস্তিবাড়ী ফিরে এলো। মিঠুনের বোন হেমা ছিল খুব সুন্দরী। সেখানে তার মতো সুন্দরী কেহ ছিলনা। এক এক সময় জয়াদেবী অর্থাৎ তাঁর মা মেয়েকে কাছে ডেকে বলতেন— "তুই কি কপাল করে ছিলি, যে আমাদের এই ঘরে এলি। তুই কেন-ও বড়লোকের ঘরে জন্মালি না ?"

হেমা তার মায়ের গলা জড়িয়ে ধরে বলতো, 'জানো মা, আমি যদি বড়লোকের ঘরে জন্মাতাম তবে হয়তো আদর পেতাম ঠিকিই কিন্তু তোমাদের এই বুক ভরা স্নেহ ভালবাসা পেতাম না তাই আমার কাছে ভাঙ্গা ঘরই স্বর্গের সমান।'

মিঠুন বলতো, "আমি প্রানপন চেষ্টা করবো আমাদের এই ভাঙ্গা ঘরের শান্তি আনার" --তাঁর কথা শুনে ঈশ্বর বোধহয় বাঁকা হাসি হেসেছিল।

এদিকে মিঠুনের মা জয়াদেবীর শরীর বিশেষ ভালো যাচ্ছিল না। তিনি প্রায়ই দুই ছেলে মেয়েকে কাছে টেনে নিয়ে বলতেন 'তোদের বাবা মরা যাওয়ার সময় আমাকে সাবধানে থাকতে বলেছিলেন, এ সংসারের উপর অভিশাপ আছে।'

মিঠুন বলে, 'তুমি মিথ্যে ভয় পাচ্ছো মা' তুমি একদম চিন্তা করবে না। আমি এতবড় ছেলে থাকতে ভয় কি ? মা বললে, "আমার নিজের জন্য কি আর ভয়, আমি এই আছি কি নেই ! আমার তোদের জন্য ভয় হয়। এদিকে চৌধুরী সাহেবের অনেক দিন থেকেই হেমার উপর দৃষ্টি — যা কিছু রমনীয় যা কিছু সুন্দর তাকে যেন ভেঙ্গে কুৎসিৎ করে তোলাই ছিল সাহেবের কাজ। তিনি অনেকবার চেষ্টা করেছেন মিঠুনের সঙ্গে ঘনিষ্ট হওয়ার। কিন্তু মিঠুন সাহেবের স্বভাব চরিত্র ভালভাবেই জানতো। তাই সব সময় চৌধুরী সাহেবকে এড়িয়ে চলতো এই এড়িয়ে চলাটা সাহেব ভালভাবেই উপলব্ধি করেছিলেন তিনি বুঝেছিলেন যে মিঠুনকে সহজ

বাগেআনা যাবে না। সাহেবের হয়তো। জেদ থাকতনা কিন্তু মিঠুনের এই রকম অগ্রাহ্যের ভাব দেখেই তিনি জিদ ধরলেন যে হেমাকে তিনি মিঠুনের কাছ থেকে যেমন করেই হোক্-কেড়ে নেবেন। "ছলে বলে কৌশলে"— যেমন করেই হোক্ তাঁর হেমাকে চাই-ই। একদিন সকালবেলা, সাহেব দু'জন সঙ্গিনীকে লেকের ধারে লইয়া গেলেন। জলে সাহেব স্নান করতে লাগলেন — সঙ্গিনী দু'জন স্নান করছিল। এমন সময় সাহেব দেখতে পেলো অপরদিকে লেকের জলে হেমা স্নান করছে। সাহেব একডুবে হেমার কাছে এসেই হেমাকে আলিঙ্গন করলেন। হেমা অনেক কষ্টে নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে ইতর, অসভ্য বলেই জলথেকে উঠে বাড়ীর দিকে তাড়াতাড়ি ফিরে গেলো। সাহেব হাঁ করে হেমার গন্তব্যস্থলের দিকে চেয়ে রইল। তারপর স্নান সেরে দু'জন সঙ্গিনীকে নিয়ে বাড়ী ফিরলেন সাহেব।

বাড়ী-ফিরে সাহেব একটি সিগারেটে অগ্নি সংযোগ করে মৃদু টান দিতে থাকেন। মিঠুন একটু নড়েচড়ে বসে বলে ওঠে — "আমাকে কি জন্য ডেকে পাঠিয়ে ছিলেন স্যার ?"

সাহেব একমুখ ধোঁয়া ছেড়ে বলেন, "হ্যাঁ তোমার সঙ্গে আমার একটা বিশেষ দরকারী কথা আছে। তাই ডেকে পাঠিয়েছি। তুমি তো হেমার দাদা I me an তুমিই তো হেমার অভিবাভক তাই আমি তোমাকেই বলছি যে, আমি হেমাকে বিবাহ করিতে ইচ্ছুক। এখন তোমার মত পেলেই শুভকার্য্য শীঘ্র সম্পন্ন হয়---কথায় আছে শুভষ্য শীঘ্রম' হাঃ হাঃ হাঃ সাহেব অট্টহাস্য করে ওঠেন। মিঠুন অবাক হয়ে যায় সাহেবের স্পর্ধা। দেখে ইচ্ছা হয় সাহেবের জানোয়ারের মতো মুখটা ছিঁড়ে কিন্তু সে ক্রোধ সামলে নিয়ে শান্ত গলায় বলে, 'না, আপনার সঙ্গে আমি হেমার বিয়ে দিয়ে সম্মানহানি করতে পারবো না।"

সাহেব স্তম্ভিত হয়ে যান সামান্য একজন কেরানীর এত বড় সাহস দেখে। প্রথমে তিনি ভেবেছিলেন যে তাঁর প্রস্তাব মিঠুন সাগ্রহে লুফে নেবে। কিন্তু মিঠুনের কথা শুনেই ক্রোধে ও অপমানে তাঁর মুখের শিরা উপশিরা দপ্ দপ্ করে জ্বলতে থাকে। তিনি ক্রোধে উন্মত্ত হয়ে চেঁচিয়ে বলেন ' তুমি কি বলছো ভেবে দেখো,

মিঠুন বলে "জানি, আমি একটা শয়তানের সামনে দাড়িয়ে কথা বলছি। আমি আর যাই করিনা কেনো জেনে শুনে মেয়েটার হাত-পা বেধে জলে ভাসিয়ে দিতে পারিনা।" কথাগুলো বলেমিঠুন সাহেবের চেম্বার থেকে বেড়িয়ে যায়। সাহেব রাগে দাঁতে দাঁত চেপে বলেন, আচ্ছা আমিও রঞ্জীত চৌধুরী তুমি কত বড় মিঠুন চক্রবর্ত্তী তা আমিও দেখে নেবো। সাহেব প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য দিন গুনতে লাগলো।

একবার মিঠুনকে অফিসের কাজে দিন দশেকের জন্য বোম্বে যেতে হয়। মাকে প্রনাম করে বোন হেমাকে সাবধানে থাকতে বলে রায়পুর ষ্টেশন থেকে বোম্বে মেলে রওনা হয়। এদিকে চৌধুরী সাহেব বুঝতে পারে প্রতিশোধ নেওয়ার এই সুযোগ। তিনি এ-সুযোগ হাতছাড়া করতে রাজী নন। সেদিন রাতেই দু'চার জন গুণ্ডা শ্রেনীর লোক নিয়ে ট্যাক্সি করে চললেন মিঠুনের বাড়ীর অভিমুখে। রাত তখন দু'টো। চারিদিকে নিঃস্তব্দ। ট্যাক্সিটা বেশ খানিকটা দূরত্বে রেখে পদব্রজেই সাহেব তার লোকদের নিয়ে বস্তীর ভিতর ধীরে ধীরে প্রবেশ করলেন, জানালা দিয়ে দেখলেন দু'টি প্রানী হেমা ও তার মা গভীর ঘুমে নিমগ্ন। এক-জন গুণ্ডা জানালা দিয়ে ঘরের ভিতর ঢুকে দরজা খুললো। ক্লোরোফর্ম ঢেলে প্রথমে হেমার পরে তার মায়ের নাকে ঢেলে অজ্ঞান করে দিল। তারপর হেমাকে সহজেই কয়েকজন মিলে ধরে ট্যাক্সিতে তুললো, তারপর সাহেব সোজা তার কোলকাতার ফ্লাটে নিয়ে আসলো, সেখানে হেমার জ্ঞান ফিরতেই অবাক হ'ল। সে এখন কোথায়? সে একবার ঘরের চারিদিকে দৃষ্টি বুলিয়ে নিল। কিছুই বুঝতে পারছে না। তারপর নিজের দেহের দিকে তাকিয়ে দেখলো যে একটা ব্লাউজ আর শায়া ছাড় তার পরনে কিছু নেই, পাশে শতছিন্ন শাড়াটা পড়ে আছে। তার দেহের উপর যে কি নির্যাতন হয়েছে তা বুঝতে বাকা রইল না।

এদিকে দিন দশেক বাদে বোম্বে থেকে মিঠুন ফিরে এসেই শুনতে পেল যে হেমাকে পাওয়া যাচ্ছেনা। তন্ন তন্ন করে খুজেও কোথাও না পেয়ে মিঠুন বুঝতে পারলো এ সাহেবের কারসাজি' নিশ্চই হেমাকে সাহেব কোথাও লুকিয়ে রেখেছে মিঠুন পুনরায় কাজে যোগ দিল বটে কিন্তু তার মন একেবারে ভেঙ্গে গেল। সে প্রতিজ্ঞা করলো এর একটা ব্যবস্থা সে করবেই। ইতিমধ্যে মিঠুন সব খোঁজ খবর নিয়ে বস্তীবাসীর বেশ কিছু লোকজনকে লইয়া কলকাতায় আসিল। খোঁজ নিয়ে জানিল যে দেশবন্ধু পার্কে'র নিকট একটি ফ্লাট বাড়ীতে

আটক রাখা হয়েছে. ট্যাক্সি করে সকলে ফ্ল্যাটের সামনে এসে উপস্থিত হলো।

এদিকে বিয়ের বাসর ঘরে চৌধুরী সাহেব যেই হেমার সঙ্গে মালাবদল করিতে যাবেন তখন দরজায় কড়াঘাত শোনা গেল. সাহেব ভাবিলেন তাঁরই কোন লোক ডাকছে। যেই মুহূর্তে দরজা খুলেছেন দেখলেন তাঁর ঠিক সামনেই মিঠুন দাঁড়িয়ে পেছনে বেশ কিছু লোক। মিঠুন দেরী না করে ঘরের মধ্যে দলবল সমেত ঢুকে পড়েন। সাহেব পালাবার চেষ্টা করতেই মিঠুন লাফিয়ে সাহেবের জামার কলার ধরে প্রচণ্ড রকমভাবে দুটি ঘুষি মারেন। সাহেব টাল সামলাতে না পেরে মাটিতে পড়ে যান। কিন্তু সাহেবও ছাড়ার পাত্র নন। তিনি তখন ল্যাং মেরে মিঠুনকে ফেলে দিয়ে আক্রমন করেন. মিঠুন মার খেতে লাগলো। এক-দিকে সাহেবের সঙ্গে মিঠুনের মারপিট এবং অপরদিকে সাহেবের কিছু গুণ্ডার সঙ্গে মিঠুনের দলবলের মারপিট চলতে লাগলো, অবশেষে মিঠুন সাহেবকে প্রচণ্ড মারতে লাগলো। সাহেব আর পেরে উঠলেন না মিঠুনের সঙ্গে।

মিঠুনের দলের লোকেরা সাহেবের সব গুণ্ডাগুলিকে দড়ি দিয়ে বেঁধে ফেললো। কারও মাথা ফেটে গেল, কেহ শুয়ে ছটফট করতে লাগলো।

মিঠুন হাপাতে হাপাতে সাহেবকে বললো কোথায় আমার বোনকে আটকে রেখেছেন ? সাহেব ইতঃস্তত করতেই আরও দুটি ঘুষি মারলো, তখন সাহেব বলল. বলছি। সাহেব মিঠুনকে সঙ্গে নিয়ে তালা খুলে একটি ঘর দেখিয়ে দিল মিঠুন দেখল তাঁর বোন হেমা বসেছিল, দাদাকে দেখে আনন্দে আলিঙ্গন করলো। চোখে তার আনন্দ অশ্রু। যাবার সময় মিঠুন সাহেবকে শাসিয়ে গেল যে, দ্বিতীয়বার এরকম হলে তাঁকে জ্যান্ত কবর দেবে। মিঠুনরা সকলে মিলে সাহেবের ফ্ল্যাট থেকে বাইরে এলো এবং মোটরে করে পুনরায় রায়পুরে ফিরে এলো।

বাড়ী পৌঁছুতেই জয়াদেবী আনন্দে হেমাকে জড়িয়ে ধরে বললেন. "এতদিন কোথায় ছিলি পাগলী ?" হেমা মাকে বলল, "মা, আমি আর তোমাকে ছেড়ে কোথাও যাব না।" সাহেব যে অমানুষিক অত্যাচার তাঁর উপর করেছে তার কিছুই মাকে জানালো না। বহুদিন বাদে তাঁর হারিয়ে পাওয়া একমাত্র মেয়েকে পেয়ে আজ তাঁর নতুন করে বাঁচবার ইচ্ছা হতে লাগলো।

এদিকে চৌধুরী সাহেব আবার রায়পুরে ফিরে এলেন এবং অফিসের কাজে পুনরায় মনোনিবেশ করলেন।

কিছুদিন পরেই মিঠুন উপর হইতে নোটিশ পেল যে কাজে গাফিলতি এবং বড় সাহেবের সঙ্গে অভদ্র ব্যবহারের জন্য তাঁর চাকরী গেছে। মিঠুন প্রথম থেকেই এটা

আঁচ করতে পেরেছিল। কিন্তু তা'হলেও সে দমলো না। তাঁর সামান্য যা পুঁজি ছিল তাই দিয়েই সে ব্যবসা আরম্ভ করলো। পার্শ্ববর্তী ষ্টেশনে যাইয়া নানারকম টুকিটাকি জিনিষপত্র খেলনা, বই ইত্যাদি ফেরী করতে লাগলো। এতে অবশ্য লাভের তুলনায় মিঠুনের পরিশ্রমটাই হয় বেশী। তাঁর শরীর ক্রমশঃ ভেঙ্গে পড়তে লাগলো।

ইতিমধ্যেই জয়াদেবী প্রত্যেক বাড়ি ঘুরে প্রত্যেকের টুকিটাকি কাজ করে দিতো তার বিনিময়ে সবাই তাকে কিছু না কিছু দিতো। মায়ের কথায় মিঠুন বললে, "তুমি বেশ বলেছো মা আমি এতবড় ছেলে থাকতে কিনা তুমি পরের বাড়ি কাজ করতে যাবে, তাতেও পোষাল না আর বলছো কিনা পরিশ্রম করে আমাদের খাওয়াবে, ওর মা জানতো মিঠুনকে ওর সংকল্প থেকে টলানো যাবে না।

রায়পুর এতদিন ছিল অখ্যাত শহর, কিন্তু হঠাৎ একদিন বিখ্যাত হয়ে গেলো। সরকারের লোক পরীক্ষা করে দেখেছে যে রায়পুরের মাটির নীচেই আছে কয়লা স্তরে স্তরে সাজানো। এছাড়া প্রচুর পরিমাণে অন্যান্য আকরিক এবং পেট্রল। রায়পুরের দাম দু'দিনেই বেড়ে গেল। দুদিনেই যেন রায়পুরের চেহারাটা পালটে গেলো।

এখন চৌধুরী সাহেবের পাশেই যে বস্তি তার নীচে ছিল স্তরে স্তরে প্রচুর পরিমাণে কয়লা। বেশ কিছুদিন পূর্ব হইতেই নোটিশ দিয়েছিলেন বস্তিবাসীদের সকলকেই উঠে যাওয়ার জন্য। কেহই তা গ্রাহ্য করেন নি, কারণ এর আগেও তিনি অনেকবার হুমকি দেখিয়েছেন উঠিয়ে দেবেন বলে। কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত তা করেন নি। এখন চৌধুরী সাহেব অস্থির হয়ে ওঠেন মিঠুনের অপমানের প্রতিশোধ নেবেন বলে আর অপর দিকে তিনি হেমাকে বিয়ে করতে চান, কোনটাকেই তিনি এড়াতে পারেন না।

*

একদিন মিঠুন শরীর খারাপ থাকায় ষ্টেশনে ফেরী করতে যেতে পারেনি, তার মা জয়াদেবী কয়েকটি বাড়িতে কাজের জন্য বেশ কিছুক্ষন পূর্ব্বেই বাহির হয়ে গেছেন। মিঠুন দুপুরে খাওয়া-দাওয়া সেরে ঘুমোচ্ছিল, হেমা সামনের ঘেরা উঠানে বসে ছিল। এমন সময় চৌধুরী সাহেব তাদের বাড়ীর দরজা খুলে প্রবেশ করেন। হেমা তাঁকে দেখেই দাঁড়িয়ে পড়ে বলে, "কাকে চাই ??',

সাহেব মৃদু হেসে বলেন, "আমার তোমাকেই দরকার।"

হেমা বলে ওঠে, "আপনি বেড়িয়ে যান, বেড়িয়ে যান বলছি।"

সাহেব বলেন, "আমি তোমাকে না নিয়ে বেড়োব না বুঝেছো।"

হেমার চীৎকারে সাহেব চমকে ওঠেন। তিনি ভেবেছিলেন বাড়ীতে বোধহয় হেমা ছাড়া আর কেউ নেই। এখন তিনি হাবার জন্য ঘুরে দাঁড়ালেন। কিন্তু

ততক্ষণে মিঠুন বাইরে বেড়িয়ে এসেছে। সাহেবকে সামনে দেখেই তার ঘার ধরে এক ধাক্কা দেয় তিনি তা সামলাতে না পেরে মাটিতে পড়ে যান। হেমা তার দাদার হাত চেপে ধরে বলে, ছেড়ে দাও।

সাহেব মাটি থেকে উঠে দাঁড়িয়ে বলে, "তোমার এতদূর সাহস, তুমি আমার গায়ে হাত তোলো।"

সাহেব চিবিয়ে চিবিয়ে বলেন, "আচ্ছা আমিও এর প্রতিশোধ না নিয়ে ছাড়বো না," এই কথা বলে সাহেব সেখান থেকে চলে যায়।

হেমা তার দাদার হাত শক্ত করে চেপে ধরে বলে, "তুমি মারতে গেলে কেন দাদা, তোমায় যদি কিছু করে ?" মিঠুন সস্নেহে বোনের মাথায় হাত বুলিয়ে বলে, "তোর ভয় কিসের রে, আমি যতক্ষণ আছি সে জানোয়ারটা কোন্ সাহসে তোর গায়ে হাত তুলতে চায়। তার ভাগ্য ভালো যে তাকে প্রাণে মারিনি। কয়েকদিন বাইরে ফেরী করে সে বাজার থেকে মায়ের জন্য একটা থান কাপড এবং বোন হেমার জন্য শাড়ী নিয়ে বাড়ীর অভিমুখে চললো। আজ তার মনটা খুব উৎফুল্ল কারণ- অন্যান্য দিনের তুলনায় আজকে লাভ হয়েছে অনেকে বেশী। তাড়াতাড়ি সে পথ চলছিল। বস্তির কাছাকাছি এসেই সে অবাক হয় যায়, তাদের বস্তীটা কোথায় গেলো- এযে একটা মাঠ দেখা যাচ্ছে। মিঠুন বোধহয় ভুল রাস্তায় এসেছে। কিন্তু না তো ? ঐ তো দুরে সাহেবের বাংলোটা দেখা যাচ্ছে মিঠুনের মনটা এক অজানা আশংকায় কেঁপে ওঠে সে এক রকম ছুটতে ছুটতে চলে। হঠাৎ সামনের এক বস্তীর ছেলেকে দেখতে পেয়ে জিজ্ঞাসা করে কিরে মুনিও। কি হয়েছে রে। এখানের বস্তাটা কোথায় গেলো। আমার মা ও বোন কোথায় ?" ছেলেটি একটি দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলে, সব শেষ হয়ে গেছে, কিছুই অবশিষ্ট নেই।" মিঠুন ব্যগ্র কণ্ঠে বলে, "কি সব শেষ হয়ে গেছে ?" - বল্ তাড়াতাড়ি বল।

মুনিয়া আস্তে আস্তে বলে, 'সাহেব আগে থেকেই নোটীশ দিয়েছিল বস্তি থেকে উঠে যাওয়ার জন্য। আজকে হঠাৎ সাহেব লোকজন পুলিশ সহ দুটি বিরাট চাকা-ওয়ালা গাড়ি নিয়ে এলো। বলে দিলো, তোমরা সব আধঘণ্টার মধ্যেই উঠে যাও নইলে তোমাদের ঘর-দোর সব ভেঙ্গে দেওয়া হবে। কিন্তু কেউই যেতে চায়না তখন সাহেব আদেশ করতেই সেই বিরাট চাকাওয়ালা গাড়িগুলো সবাইকার ঘরের উপর দিয়ে চলতে লাগলো। বস্তী থেকে সকলে ভয় পেয়ে ছুটে পালাতে লাগলো। আপনাদের বাড়ীর সামনে আসতেই, আপনার মা দু'হাত তুলে চীৎকার করে দরজা আগলে দাঁড়িয়ে রইলো, কিন্তু বড়লোকের বড় বড় গাড়ি তারা কি আর দাঁড়ায়।

তারা চলতে লাগলো, আপনার মাকে দলে-পিষে চটকে এগিয়ে চললো, তাই দেখে হেমা দিদিমণি চীৎকার করে জ্ঞান হারিয়ে পড়ে গেলো। তখন চৌধুরী সাহেব এসে তাকে নিজের গাড়ীতে তুলে নিয়ে কোথায় যেন চলে গেল।"

মিঠুন আর শুনতে পারলো না— সে থর থর করে কেঁপে উঠতে লাগলো। হাত থেকে কাপড়ের মোরকটা মাটিতে পড়ে ছড়িয়ে গেল। ওঁর সারা শরীর কান্নায় ও দুঃখে কেঁপে কেঁপে উঠতে লাগলো।

চৌধুরী সাহেব হেমাকে তার বাড়ীতে নিয়ে এল।

হেমা কাঁদতে কাঁদতেই বলে, "আমাকে ছেড়ে, আমি দাদার কাছে ফিরে যাই। আপনরে পায়ে ধরে বলছি— ছেড়েদিন, আমাকে ছেড়ে দিন।"

সাহেব বলেন, "থাক, আর কাঁদতে হবেনা এখন চুপ করে থাকো। আমি সামাজিক মতে তোমাকে আমার পত্নীরূপে গ্রহন করবো— এই বলে সাহেব যেতে উদ্যত হয়েই ফিরে দাঁড়িয়ে বলেন— আর একটা কথা, তোমার দাদার পিছনে দুটো গুণ্ডা লাগিয়েছি। তারা তোমার দাদাকে এখানে আছো বলে ভুলিয়ে নিয়ে আসবে তারপরই এখানেই শেষ করে দেবো হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ সমস্ত ঘর কাঁপিয়ে সাহেব অট্টহাস্য করে ওঠেন।" সাহেব ঘর থেকে বেরিয়ে বাইরে থেকে শিকল তুলে দেন। বিশ্বাস নেই মেয়েটা যদি পালিয়ে যায়। হেমা এই ঘণ্টা কয়েকের অভিজ্ঞতায় একেবারে বোবা হয়ে গিয়েছিল, তাই তাঁর চোখ দিয়ে জল এলোনা। শেষ পর্যন্ত কি এই শয়তানটার সঙ্গেই তাঁর বিয়ে হবে, না অসম্ভব, কিছুতেই নয় যার জন্য তাঁর দাদা এতে অত্যাচার সহ্য করলো' তাঁর স্নেহময়ী মায়ের জীবন বলি গেলো না। কিছু-তেই ওকে বিয়ে করবে না। ক্রমশঃ তাঁর মুখের রেখাগুলি শক্ত হয়ে উঠলো। একটি সংকল্প যেন তাঁর মুখে .খলে গেলো মর ব. হাঁা .স মরেই মুক্তি পাবে। ঘরের চারিদিক তাঁর দৃষ্টি ঘুরতে লাগলো। হঠাৎ একটি তাকের উপর রক্ষিত শিশির উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ হলো, তাতে লেখা আছে, "ঘুমের ঔষধ, একটির বেশী সেবনে মৃত্যু অনিবার্য।" হেমা প্রথমে তাঁর দাদাকে এবং পরে স্বর্গত মায়ের উদ্দেশ্যে প্রণাম জানিয়ে শিশি থেকে অনেকগুলি বড়ি একসঙ্গে বাহির করে মুখে পুরে চিবিয়ে ফেলে তারপর আস্তে আস্তে গিলে ফেলতে থাকে। সে আস্তে আস্তে জড়িয়ে উচ্চারন করলো, 'দাদা, তোমার হে-মা · চলে যা চ্ছে তুমি তা · কে রাখতে পারলে না,·· আঃ·· দাদা দা ···দা······ঠিক সেই মুহূর্তে নীচের থেকে মিঠুন চীৎকার করে ডাকতে থাকে, "হেমা ·· হে-মা······।

চৌধুরী সাহেব প্রেরিত গুণ্ডাদ্বয়ের প্ররোচনাতেই মিঠুন এখানে এসেছে।

সে হেমাকে ডাকতে ডাকতে উপরে উঠে আসে। বাইরে থেকে শিকল খুলে ভেতরে ঢোকে। ঢুকই দেখতে পায় তাঁর বোন হেমা গভীর ঘুমে। মিঠুন চীৎকার করে ওঠে এ তুই কি সর্ব্বনাশ করলি হেমা, কেন তুই মরতে গেলি আঃ আঃ ।

মিঠুন আর কথা বলতে পারেনা। হেমার উপর মুখ থুবড়ে পড়ে যায়। পেছন থেকে সেই গুণ্ডাদুটি মিঠুনের পিঠে ছোরা মারে। তারপর দরজা বন্ধ করে তালা দিয়ে সে স্থান ত্যাগ করে।

হেমা উঠার চেষ্টা করে—পারেনা। এদিকে চৌধুরী সাহেব গুণ্ডাদুটিকে তাদের প্রাপ্য টাকা মিটিয়ে দিয়ে ঠিক করেন বেশ কিছুদিনের জন্য কলকাতা থেকে বাইরের কোন কান্ট্রিতে যাবেন— যেমন ভাবা তেমনি কাজ।

তিনি ব্রিফকেসে জামাকাপড গুছিয়ে টাকাকড়ি নিয়ে বাহির হইতে যাবেন—দেখেন ঠিক তার সামনে পুলিশ অফিসার রিভলবার হাতে দাঁড়িয়ে পালাবার চেষ্টা করেন চৌধুরী সাহেব। কিন্তু না, পারেন না। পুলিশ অফিসার "Hands up" বলতেই সাহেব হাত দুটি তুলে দাঁড়ালেন। পুলিশ অফিসার আদেশ করতেই একজন কনসটেবল্ গিয়ে সাহেবের হাতে হাতকড়া পড়িয়ে দেয়। তারপর সাহেবকে টানতে টানতে নিয়ে প্রহার করে পুলিশ ভ্যানে তুলে থানায় যাওয়া হয়, বিচারে সাহেবের তিন বছর জেল হয়। তাঁর কাপড়ের দোকান এবং সংলগ্ন চোরাই কুঠির সন্ধান পেলো। সমস্ত কিছু বাজেয়াপ্ত করা হলো। রায়পুরের সম্পত্তি থেকে পুলিশ চৌধুরী সাহেবকে রেহাই দিলো।

তিনবছর পরে সাহেব জেল থেকে ছাড়া পেলেন তিনি পুনরায় রায়পুরে ফিরে গেলেন— তাঁর শরীর ক্রমশঃ ভেঙ্গে গেল। এদিকে তালা ভেঙ্গে শিকল খুলে হেমা এবং মিঠুনকে সংজ্ঞাহীন অবস্থায় পাওয়া গেল। পুলিশ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলো অ্যাম্বুলেন্সে করে। পরে সেবা যত্নে দু'জন সুস্থ হয়ে উঠলো, তারপর ভাই বোন দু'জনেই রায়পুরে ফিরে এলো। বস্তীবাসীদের সকলে খুব আনন্দ করলো। এরপর মিঠুন সুপাত্র দেখে তাঁর বোন হেমার বিবাহ দিলেন।

একদিন রাত্রে বাংলোয় ড্রিঙ্ক করে রেকর্ড প্লেয়ার চালিয়ে যখন দু'জন সঙ্গিনীকে নিয়ে নেচে চলেছেন সেই সময় মিঠুন এবং অনুপ হালদার রাত্রির অন্ধকারে আস্তে আস্তে সাহেবের বাংলোর সামনে এলো। তারপর দু'জনে রিভলবার হাতে পাঁচিল টপকে ভিতরে প্রবেশ করে জানার শার্সি দিয়ে দেখলো দু'জন সঙ্গিনীকে নিয়ে সাহেব নাচছেন কোনো দিকে ভ্রূক্ষেপ নেই। মিঠুন ধীরে ধীরে শার্সি কায়দা করে খুলে রিভলবার তাক করে চেঁচিয়ে বললেন খুব্তে, তেরা

খেল্ খতম্। নাচ থামিয়ে সাহেব চম্‌কে উঠে দেখেন মিঠুন ও অনুপ তার দিকে রিভলবার তাক্ করে আছে। সঙ্গিনী দুজন ভয়ে সেইঘর হইতে পালিয়ে বাঁচলো কিন্তু সাহব পালাতে পারলো না একসঙ্গে ঝাকে ঝাকে রিভলবারের গুলি তাকে এফোড় ও-ফোঁড় করে প্রাণবায়ু বের করে ছাড়লো। সাহেবের শূন্য দেহ মাটিতে পড়ে গেলো। তারপর দু'জনে বস্তীবাড়ীতে ফিরে এলো। পরদিন বস্তীবাসীদের সকলে মিলে সাহেবের বাংলোয় এলো, কিন্তু ঠিক বুঝতে পারলো না। পুলিশ ভাবলো সাহেব নিজেই আত্মহত্যা করেছেন অথবা সঙ্গিনী দু,জন সাহেবকে হত্যাকরে পালিয়েছে। তারপর সাহেবের মৃতদেহ খাটে করে ফুল সাজিয়ে ধূপ দিয়ে রাস্তা ধরে শ্মশানের দিকে নিয়ে যাওয়া হলো। যথা-নিয়মে সৎকার করা হল। বস্তীবাসীদের মুখে হাসী ফুটে উঠলো। মৃত্যু তো চিরদিনই দুঃখের কিন্তু এমন অনেক মৃত্যু আছে যা দুঃখের মধ্যেও একটা ভবিষ্য-তের সুখের ইঙ্গিত দেয়, এ মৃত্যু ঠিক তাই। মানুষ জানেনা তার ভাগ্যে কি আছে। খারাপ কাজ করলে তার শাস্তি আছে এটা ধ্রুবতারার মত সত্য। হেমাও তার চিরশত্রুর হাত থেকে বাঁচলো। মিঠুনও বিয়ে করে সুখে ঘর সংসার করতে লাগলো। এই আনন্দবাসরে হেমাও এলো তার স্বামীর সঙ্গে রায়পুরের বস্তিবাসীরা সকলে একটা আনন্দ উৎসবে যোগ দিল। সমস্ত রায়পুর জুড়ে শান্তি· স্বস্তির ভাব এলো।

★ ★